নীলফামারী জেলাধীন কিশোরীগঞ্জ থানার অন্তরগত
সিঙ্গেরগাড়ী জহুরীয়া দরবার শরীফের

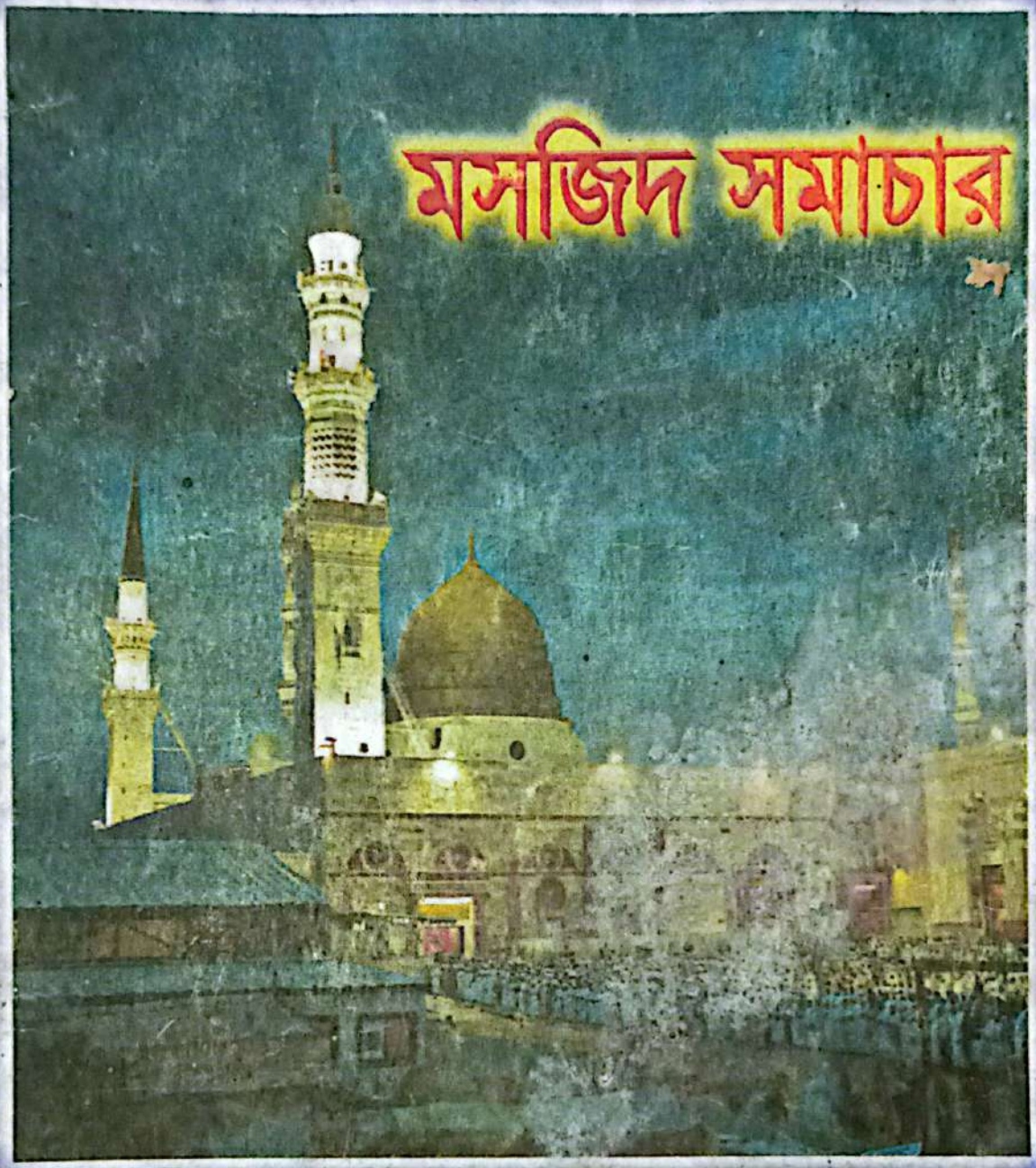

মসজিদ সমাচার

গ্রন্থকার
শাহ্ মুহাঃ শামসুল আলম আজিজি

নীলফামারী জেলাধীন কিশোরীগঞ্জ থানার অন্তরগত
সিঙ্গেরগাড়ী জহুরীয়া দরবার শরীফের

মসজিদ সমাচার

গ্রন্থকারঃ
শাহ্ মুহাঃ শামসুল আলম আজিজি
সিঙ্গেরগাড়ী জহুরীয়া দরবার শরীফ
আস্তানে আজিজিয়া, ছমির-নগর
থানা-কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

মসজিদ সমাচার

শাহ্ মুহাঃ শামসুল আলম আজিজি

প্রকাশকঃ
আলহাজ্ব মোঃ বাবলু সরকার (খলিফা)
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

স্বত্বঃ
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশ কালঃ
২১ অক্টোবর ২০০০৬ইং
৬ আশ্বিন ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।
২৭ রমজান, ১৪২৫ হিজরী।

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ
মোঃ গোলাম মওলা খাঁন বাবলু
শেরনগর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।
ও
মোঃ মোকাদ্দেছ হোসেন
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণেঃ
শাপলা কালার সিস্টেম, পায়রা চত্বর, রংপুর।
মোবাইল: ০১৭১৬২৩৮৪২০, ০১৫২৩৪০১১৬

প্রুফ রিডারঃ
আলহাজ্ব সালাউদ্দিন তালুকদার (খলিফা)
মোঃ আব্দুল মোত্তালিব খলিফা

প্রাপ্তিস্থানঃ
সিঙ্গেরগাড়ী জহুরীয়া দরবার শরীফ
আস্তানে আজিজিয়া, ছমির-নগর
থানা-কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

রসনায় মম ছলাকলা নাহি
নাহি কহি কোন কটু কথা
মিথ্যার আশ্রয় নাহি লই কভু
পরপ্রজন্মের কাছে শুধু ইতিহাসরূপে
গাহিনু সত্য কথা॥
প্রবঞ্চনা নাহি ইহার মাঝারে
যদি থাকে তা অলক্ষ্যে,
প্রমাণ করিতে পারিলে
তার কাছে আমি করিব হেট মাথা॥

-শাহ্ মুহাঃ শামসুল আলম আজিজি

ধরার মাঝে অমর আমি
কীর্তি আমার নাম
সদায় ঘুরি মনের মাঝে
স্বর্গ আমার ধাম॥
মানবদেহ মাটিতে মিশবে
থাকবে না কিছু তার,
কেবল হেথা থাকি আমি
পড়ি সুযষ হার॥

-জনৈক কবি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং তারই প্রিয় আঁকা সাইয়্যেদুল মুরছালীন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর প্রতি লাখো দরুদ ও সালাম।

অতঃপর সিঙ্গেরগাড়ী জহুরীয়া শরীফ বায়তুননুর শাহী মসজিদ ও পুরাতন মসজিদ প্রসঙ্গে লেখক যে "মসজিদ সমাচার" গ্রন্থটি প্রাঞ্জল ভাষায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সঠিক তথ্য সম্বলিত, সচিত্র প্রতিবেদনসহ উপস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তা অত্যন্ত দুর্লভ চিত্র ও সত্য তথ্য সম্বলিত যা অকাট্য সত্য ইতিকথা। আমার জানা মতে এ তথ্যগুলিতে তিনি কোন অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বইটির প্রতি ছত্রে ছত্রে সত্য ঝংকারিত হইয়াছে। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত শুধুমাত্র সত্য গাহিয়াছেন। ইহাতে ভাষার শালীনতা ডিঙ্গিয়া কিংবা কটুক্তি করিয়া কাহারো প্রতি আক্রমণমূলক আচরণ প্রকাশ পায় নাই। শুধুমাত্র সুধি পাঠকের জ্ঞাতার্থে সত্য ইতিকথা উপস্থাপন করা হইয়াছে। জ্ঞানী পাঠককে গ্রন্থটি এক নজর পড়িয়া দেখার জন্য অনুরোধ রহিল।

পরিশেষে গ্রন্থকারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া শেষ করিতেছি।

মরহুম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি আলহাজ মোজাম্মেল হক (রঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র

পীরজাদা ডাঃ শাহ্ মোঃ জোবায়ের হোসেন (মজনু)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অসীম দয়ালুদাতা সর্বশক্তিমান ও আমাদের আঁকা সাইয়্যিদুছ সাক্বালাইন নবীউল হারামাইন, ইমামুল ক্বিবলাতাইন এর নেক তোফায়েলে আমার স্বীয় ক্বিবলাজানের দোয়ার বদৌলতে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হইয়া বিশাল বিষয়বস্তুর উপর মতামত দান করা একেবারেই অসম্ভব। তারপরেও মানবীয় কারণে মনুষত্বহীনতা, কুচক্রি সুধী সমাজকে কিরূপভাবে পর্যুদস্ত করতে পারে 'মসজিদ সমাচার' বইটি তারই প্রতিধ্বনি মাত্র। এ যেন আশুরার প্রতিধ্বনি বয়ে আনছে মর্মে আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখিত। সত্যান্বেষীদের জন্য সহায়ক হোক কামনা করে শেষ করছি।

ইতি

মাওলানা মোঃ গোলজার হোসাইন জেহাদী

সহকারী মাওলানা

আলীগ্রাম সিনিয়র মাদ্রাসা

শিবগঞ্জ, বগুড়া।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নূরে চশম বখত বুলন্দ মহান করুণাময়ের অসীম কৃপায় সরোয়ারে কায়েনাতের নেক তোফায়েলে আমার কেবলাজানের নেক দোয়ার বদৌলতে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে স্বল্প পরিসরে প্রকাশিত বিশাল তথ্যবহুল অজ্ঞাত দলীলাদিসহ যে বিশাল ভাবমূর্তি অল্প কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তা সত্যিই ভাবিতে অবাক লাগে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই জ্ঞান সমুদ্রে নিজকে তৃণের ন্যায় হাবুডুবু খাইতেছি মনে হয়। তারপরেও যা উপলব্ধি করেছি সত্যিই হৃদয়বিদারক, লোমহর্ষক। চক্রান্ত ও নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে পদ্মলোচনও হার মেনেছে। লেখকের এই বেদনার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করে তার লেখনিশক্তি বৃদ্ধি হউক এবং হক্ব ও বাতিলের ফয়সালার নিদর্শন যন্ত্রস্বরূপ দৃষ্টান্ত হউক যাহাতে হক্বের ক্ষেত্রে মসজিদ সমাচার বইটি ফুটে উঠেছে অকাট্য সত্য। সাধ্য থাকলে প্রতিপক্ষ এরূপভাবে প্রতি ছত্রে ছত্রে উত্তর দিয়ে জাতিকে জানাবেন। তাহলে সর্বসাধারণের ভ্রম ভঞ্জনের জন্য অকাট্য দলিল হইবে। নচেৎ গ্রন্থাকারের গ্রন্থনা সত্যিই জাতিকে বেদনার নাড়া দিবে।

ইতি

মাওলানা মোঃ আব্দুল ওয়াহাব

সুপার

গাংনগর দাখিল মাদ্রাসা

শিবগঞ্জ, বগুড়া।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু জহুরীয়া দরবার শরীফের বর্তমান গদ্দীনশীন আলহাজ্ব শাহ মুহাঃ শামসুল আলম আজিজি শুধুমাত্র মসজিদ সমাচার বইটিতে মসজিদ পৃথকীকরণের কারণ দর্শাইয়া শেষ করেন নাই। কুআনুল কারীম হইতে অকাট্য দলিল ও ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক স্মৃতিফলক এর দৃষ্টান্তে পৃথিবীর এত বেশি মসজিদের বিবরণ দিয়েছেন জনমেও তা ভাবিতে পারি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মসজিদগুলি অকাট্য সত্য বিবেচিত হইলে জহুরিয়া শরীফ বাইতুন্নুর শাহী মসজিদ কেন বৈধ হইবে না প্রতিপক্ষের কাছে আমার জিজ্ঞাসা রহিয়া যাইবে। সম্ভব হইলে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক স্মৃতিফলক দৃষ্টান্ত যেসমস্ত মসজিদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ঐরূপ কোন দলিলাদি দিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলে আমরা দ্বিধামুক্ত হইব।

ইতি

মাওলানা মোঃ আক্তারুজ্জামান

আরবি প্রভাষক

আলাদীপুর সিনিয়র মাদ্রাসা

শিবগঞ্জ, বগুড়া।

বিসমিল্লাহির রাঃ মানির রাহিম

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার মেহেরবাণীতে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেক নজরে আমার দাদাজান ও ক্বিবলাজানের দোয়ার বদৌলতে মসজিদ সমাচার বইটির পাণ্ডুলিপি পড়িতে সক্ষম হইয়াছি। যা উপলব্ধি করিলাম তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক। পুরাতন মসজিদ ভবন নির্মাণে লেখক যে শ্রম দিয়েছেন প্রতি পদক্ষেপে বাধা ও প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করিয়া ক্বিবলাজানের স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ ঘর নির্মাণ করে পুরস্কারস্বরূপ নির্যাতন ও চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য আমরা পূর্বে অবাধে মাজার জিয়ারতসহ যাবতীয় কাজ শান্তিপূর্ণভাবে পালন করিতে পারিতাম। তা আজ তালাবদ্ধ থাকায় এবারে ওরস শরীফে গিয়া বাধাগ্রস্ত হইয়াছি।

ইতি

মমতাজুল মোহাদ্দেছিন আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত
শিবগঞ্জ, বগুড়া
ও
সেক্রেটারী
জাতীয় ইমাম সমিতি
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

মাওলানা নাজমুস্ সায়াদাত ফয়েজী

এম.এম. (ফার্স্টক্লাস) এম.এফ.ডবল টাইটেল

খতীব

মসজিদ-এ-বেলাল হুমায়ুন রোড, জেনেভা ক্যাম্প,

মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭।

সূত্র ঃ

তারিখঃ ২৪/১০/০৬ইং

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

اما بعد -

পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার বেশুমার শুকরিয়া- ও স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি লাখো কোটি দরুদ ও সালাম,

সাথে সাথে নেক হায়াত কামনা করি সিদ্দিক গাজী তহবাজা- পরবার সরীফের- গদ্দিনশীন হাদিয়ে জামান আহ্- খামছুল আলম হুজুর কেবলার- এই জন্য যে, তিনি মুসলিম জাতীর কাছে সু-রচিত মসজিদে সাম্মাদ ... বইখানা উপহাপন করে চির সত্য কে প্রমান করেছেন এবং সত্যতা প্রমান করেছেন দুনিয়া বিখ্যাত সুফি সাধক।

আল্লাহ পাক তাঁর এই সুবিশাল ইমানী খেদমত কবুল করুন, আমিন - ছুম্মা আমিন

খাকছার -

মোঃ নাজমুস সায়াদাত ফয়েজী

২৪/১০/০৬ইং

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ প্রশংসা ও প্রিয় নবী পাক (সঃ) এর প্রতি অসংখ্য দরুদ ও ছালাম।

পরকথা লেখক শাহ্ মুহাঃ শামসুল আলম সাহেবের প্রণীত মসজিদ সমাচার বইটি পড়ে যা বুঝলাম আমরা গ্রামবাসী হিসেবে স্বচক্ষে যা দেখেছি ও নিজ কানে যা শুনেছি তা অকাট্য সত্য দ্বারা অবিকল চিত্র তুলে ধরেছেন। লেখকের এহেন উপস্থাপনায় বইটি সার্বিক দিক দিয়ে বিবেচনা করিলে সুন্দর সহজ ভাষায় সত্য ইতিকথাগুলি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সুধী পাঠককে বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ রইল।

স্বাক্ষর

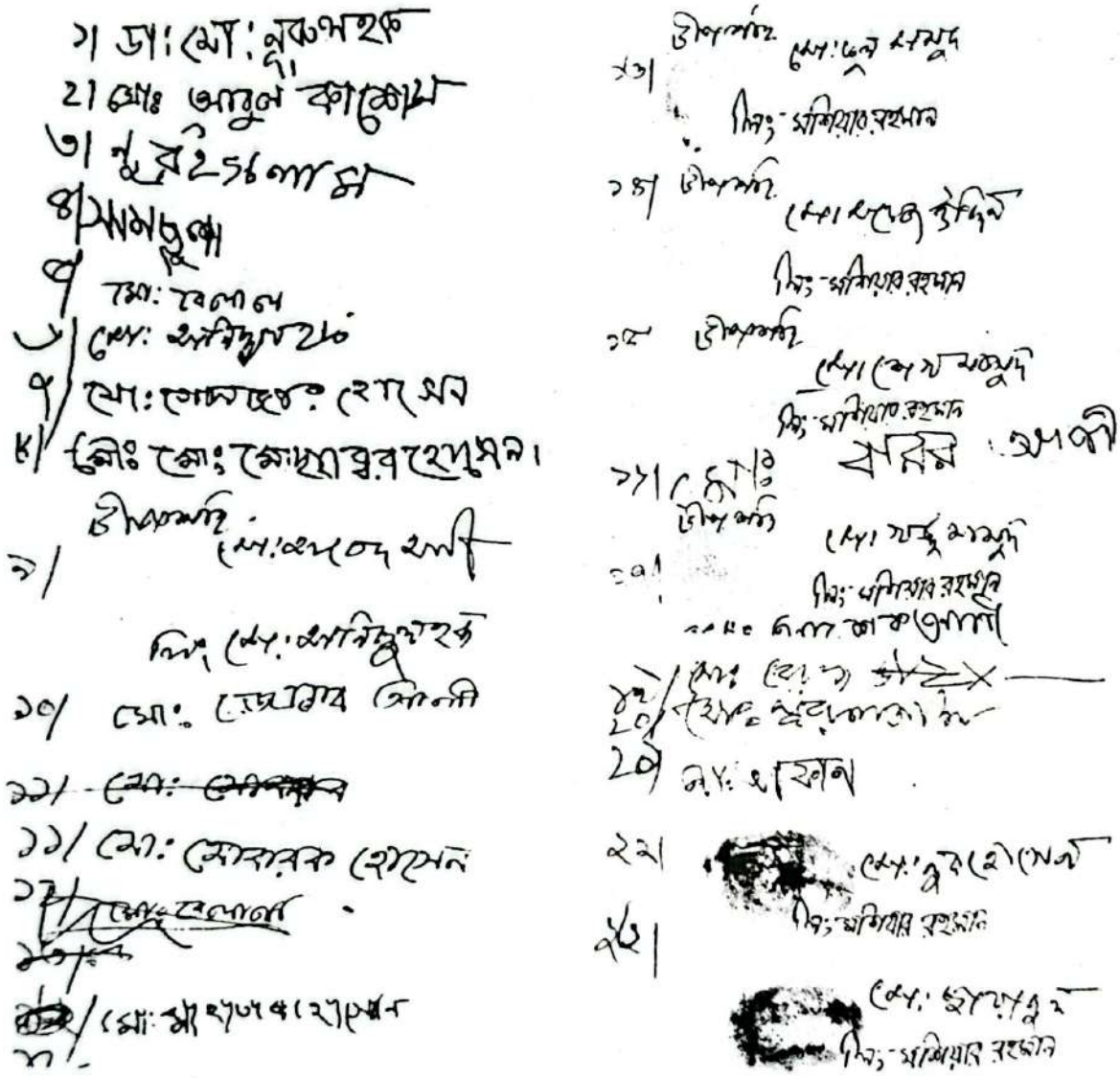

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমুদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসুলিহীল কারীম

"নাইবোতাতে ইবতেখারো নাইবো তাকওয়া পুস্তেমা

বরণে গাহে রহমাতাল্লীল আলামিল্লাহ জিমেমা।"

অর্থঃ আমার ইবাদত বন্দেগীর কোন গৌরব নাই কিন্তু আমার ঐদিকে দৃষ্টি আছে রাসুলে পাক (সঃ) আমার নেগাবানের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহলে ইহাই আমার গৌরব বা ভরসা।

অতঃপর আমার মুর্শিদে বরহক সিঙ্গেরগাড়ী জহুরীয়া দরবার শরীফের বর্তমান গদ্দীনশীন হযরতুল আল্লামা আলহাজ শাহ মুহাঃ শামসুল আলম আজিজি মাদ্দাজিল্লেহা কেবলাজান জ্ঞান সিন্ধু, শ্রুতিধর পণ্ডিত উপাধীতে ইতঃপূর্বেই স্বীয় মুর্শিদ কর্তৃক ভূষিত হইয়া ছিলেন। আমিও তার নবীপ্রেম দেখে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অসাধারণ পান্ডিত্য ও অত্যন্ত স্নেহবৎসল ন্যায়পরায়ণ মিষ্ট ভাষী সত্যনিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুভক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন বিচক্ষণতা দানবীরত্ব ইত্যাদি দেখে অভিভূত হয়ে কখন যে আত্মসমর্পণ করেছি তা আমি নিজেও টের করতে পারি নাই। পরে মুরীদ হয়ে ইহার বহিঃপ্রকাশ করেছি। একজন দক্ষ লেখক, আধ্যাত্মিক সাধক ও শিক্ষক, দক্ষ ভাষাবিদ হিসেবে পেয়ে ও তার সাহচর্যে নিজেকে ধন্য মনে করছি। খুব শীঘ্রই খেদমত করার সুযোগ পেয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কিঞ্চিত দিশা পাই ও কেবলাজান কর্তৃক খেলাফতে আদিষ্ট হই। তেনার অত্যন্ত গুরুভক্তির কারণে পূর্বসূরীগণের মধ্যে শ্রদ্ধাভাজনশীল আম্মাজান, দাদাজান, চাচাজান ও কেবলায়ে আলা কামেলে মোকাম্মিল বাবা হযরত শাহ জহুরুল হক (রঃ) এর সমাধিস্থল স্মৃতিসৌধসহ মসজিদ গৃহটি অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ও অবহেলিত দেখে তা পুনঃ সংস্করণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অর্থাভাবে যথাসময়ে তা সম্ভব হয় নাই। নিজের সংসারের আয় হতে মোটা অংকের কিছু অর্থ সংগ্রহ করে আমাদের সহযোগিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশিষ্ট অর্থ আলহাজ্ব গোলাম মওলা খাঁন বাবলু ও মোকাদ্দেস হোসেনের বৃহৎ সহযোগিতায় কাজটি করতে সক্ষম হন। কিন্তু জ্ঞাতী হিংসা, পরশ্রীকাতরতার বেড়াজালে পরে শুধুমাত্র একজুম্মা সকল মুসল্লীগণকে সাথে নিয়ে জুমার নামাজ আদায় করে স্বেচ্ছায় মসজিদ গৃহটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। শুধুমাত্র শান্তি, শৃঙ্খলার আশায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ জনসমর্থন হারিয়ে অদ্যাবধি কুটনামী, বদনামীর পথ বেছে নেন। একই দরবার শরীফে পাশাপাশি দুইটি মসজিদ? এই উদ্ধৃতি দিয়ে নতুন আগুন্তক ও দেশবাসীকে ধোকা দিচ্ছিলেন। আমরাও বিভিন্ন ব্যক্তির সামনে জিজ্ঞাসিত হয়ে থাকি একই কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করে কতজনকে কতবার বলা যায়। এহেন পরিস্থিতি দেখে মসজিদের আদ্যপান্ত ইতিহাস সহ একটি বই লেখার জন্য

কেবলাজানের কাছে অনুরোধ করি। তখন সকলের অনুরোধে মস। পৃথকীকরণের কারণ হিসেবে "মসজিদ সমাচার" বইটি আত্মপ্রকাশ করেন যাতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় দীর্ঘদিনের ইতিহাস পূর্বসুরীগণের যথাযথ মর্যাদা দান পূর্বক স্বচিত্র এ প্রতিবেদনটি ছিল। বইটিতে কাহারও প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ পায় নাই বা কাহারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ উত্থাপন করা হয় নাই। শুধুমাত্র মসজিদ বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে যা না লিখলে নয় ততটুকু মাত্র লেখা হয়েছে। বইটির পান্ডুলিপি নিষ্ঠার সাথে লিপিকাবদ্ধ করে প্রকাশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন। পারিপার্শ্বিক বিঘ্নতার জন্য বিলম্বে বইটি প্রকাশ ঘটলে এহেন অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমি দুঃখিত। আশাকরি পাঠক বইটি পড়লে মসজিদ পৃথকীকরণের কারণ হিসেবে বিষয়টির হুবহু চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে। লেখকের এহেন উপস্থাপন ক্ষমতা দেখে আমি নিজে অভিভূত। মসজিদ পৃথকীকরণের কারণ হিসেবে বইটি পাঠকের মানসপটে বেদনার নাড়া দিতে পারলে লেখকের গ্রন্থনা ও আমার প্রকাশনা সার্থক হবে। ভুল প্রদর্শিত হলে কৃতজ্ঞতার সাথে সংশোধন করব।

বিনীত
আজিজিয়া কমপ্লেক্সের প্রকাশনা
বিভাগের পক্ষ থেকে

আলহাজ্ব মোঃ বাবলু সরকার (খলিফা)
বেলকুচী, সিরাজগঞ্জ।

তাং- ২৫/৯/২০০৬

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম। অশেষ প্রশংসা করি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যার মেহেরবাণীতে ক্ষুদ্র আকারে হলেও একটি সাময়িক ভ্রম ভঞ্জনের জন্য পুস্তকখানা রচনা করতে সক্ষম হয়েছি। কতটুকু কৃতকার্য হয়েছি সুধী পাঠকমন্ডলীর বিচক্ষণতার দ্বারা বিবেচিত হবে। যে মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। তারই প্রিয় আঁকা তাজেদারে মদীনা, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, সাইয়্যিদুস সাক্বালাইন, নাবীউল হারামাইন, ইমামুল ক্বিবলাতাইন, রাহমাতাল্লিল আলামীন জনাব নূর নবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে লাখো সালাত ও সালাম পেশ করিতেছি ও আমার জান্নাতবাসী আব্বা-আম্মা ক্বিবলাজানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অতঃপর জাকের-জাকেরান, মুরীদ-মোতাকেদ, আশেকানে রাসুল (সাঃ) সালেকানে ত্বরিকত ও আমার ক্বিবলাজান (রঃ) এর রূহানী সন্তানগণের এবং গ্রামবাসী যেনারা পবিত্র মাজার শরীফ ও মসজিদের নির্মাণ কার্যে শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা করিয়াছেন সকলের সহযোগিতায় প্রায় দশ লক্ষ পঁচাশ হাজার টাকা (১০,৫০,০০০.০০) ব্যয়ে ইমারতটি নির্মাণ করা আমার জন্য সহজসাধ্য হইয়াছিল। হঠাৎ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া শুধু মাজার শরীফ গ্রহণপূর্বক মসজিদ গৃহটি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র নতুন মসজিদ নির্মাণ করিয়াছি। ইহাতে সাময়িকভাবে মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের সৃষ্টি হইতে পারে। যেহেতু এতবড় একটি মহান কাজ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়া স্বেচ্ছায় নীরবে সরিয়া পড়িলাম তাই পাঠক, সুধীমন্ডলীর অবগতির জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি রচনা করিলাম। যেমন আবু রায়হানের ধোকা এরূপ ছিল- একদিন আমি আমার রংপুরের বাসায় থাকাকালীন আমার বড় ছেলে শাহ্ মুহাঃ গোলাম মুরতুজা আজিজি টেলিফোনযোগে আমাকে অবগত করিল যে, আব্বা মদীনা শরীফ হইতে একটি চিঠি আসিয়াছে। তাতে লেখা আছে আমাদের মসজিদ নাকি যায়েজ হবে না। বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝার জন্য বাড়িতে দ্রুত ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, উপরোক্ত উক্তিটি কাহার মুখে শুনিয়াছ? অতঃপর বর্ণনাকারী ঝেল্লা মামুদের পুত্র আমজাদ হোসেনের মুখে শুনিলাম যে, আবু রায়হান বলিয়াছে ঐ মসজিদে নামাজ হইবে না। মূলতঃ মাসিক মদীনা পত্রিকাটি দর্শাইয়া কিরূপ মিথ্যা প্রতারণা করিয়াছিল। তখন আমি শাবান চাঁদের মদীনা পত্রিকাটি সংগ্রহ করিয়া বিষয়টি সঠিক হইলাম। বিষয়টি ছিল নিম্নরূপঃ-

সুওয়াল জওয়াব অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর বিভাগ
শাবান ১৪২৫ হিজরী
অক্টোবর ২০০৪ ঈসায়ী
প্রশ্ন নংঃ- মীর খয়বর আলী
বাড়াটি, আঠারোখাদা, চুয়াডাঙ্গা।

কোন একটি মসজিদ পুরাতন রেকর্ড অনুযায়ী ব্যক্তির নামের সম্পত্তির উপর নির্মিত। কোন ওয়াকফ্ বা দানপত্র দলিল করা হয়নি। জানা গেল যে, বর্তমান আর, এস রেকর্ড সরকারি বিধি মোতাবেক সঠিক হয় নাই। কারণ ঐ রেকর্ডের স্বপক্ষে কোন দলিল নাই। যার ফলে ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যে কোন সময় দাবীদার হতে পারে। এ বিষয়ে সবসময়ই জনমনে সংশয় থেকে যাবে এবং এখনো আছে। বর্তমানে মূল দাতার ওয়ারিশগণের মধ্য হতে কিছু লোকের প্রভাব এবং নেতৃত্ব ছাড়া প্রতিষ্ঠানের কোন কাজ হতে পারে না। তাঁরা গ্রামের অন্য লোকদের কারোরই কোন পরামর্শ শুনতে রাজি না। এহেন আচরণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা এই প্রতিষ্ঠানের পরোক্ষ মালিকানার দাবীদার। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন হচ্ছে, কোন মসজিদের নামে দলিলাদি ছাড়া তাতে এবাদত বন্দেগী সঠিক হবে কি না? এ বিষয়ে কোরআন ও ছহী হাদিস মোতাবেক জবাব দিয়ে এ জটিল সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করলে বাধিত হবো।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য ওয়াকফ্ মৌখিকভাবে করাই যথেষ্ট। লিখিত দলিল সম্পাদন করার প্রয়োজন হয় না। মসজিদটির অবস্থানই দলিল। কোন ব্যক্তির পক্ষে মসজিদের জন্য কোন জায়গা মৌখিকভাবে দান করার পর বা গৃহ নির্মাণ করে তা সাধারণের জন্য নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে দিয়ে দেয়ার পর আর সেটির উপর দাতা বা তাঁর ওয়ারিশগণের কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকে না। যদি এমন কেউ কর্তৃত্ব দাবী করেন তবে সেটা অন্যায় হবে এবং ইসলামী আইনে মোটেও গ্রাহ্য হবে না। দান করার সময় যদি দাতা এরূপ কোন শর্ত যুক্ত করে দেন যে, এই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ন তিনি যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন নিজে করবেন এবং তার মৃত্যুর পর অলী-ওয়ারিশগণের মধ্য থেকে কেউ করবেন তবে মোতাওয়াল্লী শুধু তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কর্তৃত্ব বলতে যা বোঝায় তা করতে পারবেন না। যেমন মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া, কাউকে মসজিদে আসতে পরোক্ষভাবে হলেও বাধা প্রদান করা, মসজিদের উন্নয়ন কার্য আটকে রাখা, মসজিদের অর্থ ইচ্ছামত ব্যয় করা ইত্যাদি। মোটকথা, মসজিদের জন্য যা কিছুই

মৌখিকভাবে হলেও দান করলে সে দানের গ্রহীতা স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং দান কার্য সমাধা হয়ে যাওয়ার পর আর এতে অন্য কারো কোন প্রকার হস্তক্ষেপ মোটেও বৈধ হবে না। লিখিত দলিল-দস্তাবেজেরও প্রয়োজন নাই। পৃঃ ৪৭।

এতদসমূহ মিথ্যা প্রচারণায় সমাজকে ও আমার ভক্তবৃন্দকে কীটদষ্ট করিতেছিল। তখন আমি বাধ্য হইয়া এই মসজিদের আদ্যপান্ত কাহিনী সুধী পাঠক মহোদয়ের অবগতির জন্য মসজিদ সমাচার বইটি রচনা করলাম। ইহা শুধুমাত্র জনমনে একটা ভ্রমভঞ্জনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বিনীত

গ্রন্থকার

শাহ্ মুহাঃ শামসুল আলম আজিজি

কাহারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সালিশ চেয়ে এ অভিযোগ উত্থাপন হয়নি। শুধুমাত্র পরপ্রজন্মের কাছে মসজিদ পৃথক করার কারণ হিসেবে এ প্রতিবেদনটি পেশ করা হলো।

যেভাবে পুরাতন মসজিদ ছেড়ে চলে এলাম ও কিছু ইতিকথাঃ

পুরাতন ঐতিহ্যবাহী জহুরিয়া শরীফ জামে মসজিদ যার কাছে আপনাআপনি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয় যে, মসজিদ ও মাজার স্বশ্রদ্ধভাবে নগ্নতা থেকে পূর্ণাঙ্গ দর্শনীয় স্থান রূপ দান করে স্বেচ্ছায় নীরবে বের হয়ে আসলাম, সে মসজিদে অস্থায়ী মসজিদ থেকে মূল মসজিদ ভবনে আসার পূর্ব জুম্মার দিন যেভাবে অস্থায়ী মসজিদে জুম্মা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কথা হল, দীর্ঘ ৫ মাস ধরে মসজিদের কাজ চলাকালীন আবেদনকৃত সাইনবোর্ডটি অস্থায়ী মসজিদের দরজায় ঝুলন্ত ছিল। বিনা আপত্তিতে একত্রে নামাজ আদায় করতাম। কোন দিনও আবেদনকৃত সাইনবোর্ডটির বিষয়ে ক্ষীণ আকারে হলেও আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। যখন অস্থায়ী মসজিদে জুম্মার দিন আমি ঘোষণা দিলাম, আগামী জুম্মার নামাজ মূল মসজিদ ভবনে আদায় করা হবে। তখন মুসল্লিবৃন্দ উল্লাসের সহিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু আব্দুস সালাম বেলু সাহেব বললেন, ঐ সাইনবোর্ড যুক্ত থাকলে ঐ মসজিদে নামাজ যায়েজ বা কবুল হবে না। অস্থায়ী মসজিদটি থেকে সরে গেলে তার সকল আসবাবপত্রের আর প্রয়োজন থাকত না। মূল ভবনের সকল কাজ সমাপ্ত হলে আবেদনকৃত সাইনবোর্ডটি রাখার কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ধৈর্য্যের সীমা ভেঙে গিয়েছে, আর তিনি বাধ মানতে পারলেন না। যেহেতু তিনি আলেম লোক। সাধারণ মুসল্লিদেরকে ফতোয়াটি জেনে দেওয়া তেনার নৈতিক দায়িত্ব ছিল। তাই তিনি দীর্ঘ ৫ মাস পরে মুসল্লিদেরকে এ ফতোয়া দান করে দায়িত্ব হতে নিস্কৃতি পেলেন।

ভেবেছিলেন মুসল্লিগণ মসলার ভয়ে উনার মতে মিল দিয়ে উনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাবেন। আর ফতোয়াটি খুঁজতে বিলম্ব হয়েছিল মর্মে কাজ চলাকালীন এ ফতোয়াটি প্রকাশ করেন নি। অথচ সেদিনও অস্থায়ী মসজিদের দরজায় আবেদনকৃত সাইনবোর্ডটি ঝুলতেছিল। এখন প্রশ্ন হল, ঐ পাঁচ মাসের নামাজ ওনার কবুল হয়েছে কি না? না শুধু কাজ আদায়ের লক্ষ্যে এই ফতোয়াটি জারি করতে বিলম্ব করেন? সেদিন হতে তারপরের জুম্মার নামাজের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এবং তেনার সহযোগীগণ দলবেঁধে ডোর টু ডোর ফতোয়াটি প্রচার করতে থাকলেন যে, 'ঐ সাইনবোর্ড থাকলে নামাজ যায়েজ হইবে না।" এতে যখন কোন ফল হল না, শুক্রবার যথাসময়ে মুসল্লিগণ উল্লাসের সাথে দলবেঁধে একত্র হয়ে জুম্মায় সমবেত হচ্ছিলেন। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গোপন বৈঠকের

সিদ্ধান্তে আর কোন উপায় করতে না পেরে লোক নিযুক্ত করে উনাদের যে জায়গার উপর দিয়ে সোজা মসজিদ ভবনে যাওয়া যায় সেই পথে মসজিদে যাওয়ার জন্য বাধার সৃষ্টি করলেন। তখন গ্রামের মুসল্লিগণ বিকল্প পথে আঁকা বাঁকা হয়ে সেদিনের মতে মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামাজ আদায় করলেন। আমরা যখন মসজিদে নামাজ পড়তেছিলাম তখন তেনারা মসজিদের পেছনে জমায়েত হয়েছিলেন। আমরা জানতে পেরে, যদিও আযানই নামাজের চূড়ান্ত আহবান, তথাপীয় আব্দুল কাদের মেম্বারকে পাঠিয়ে দিয়ে মসজিদে আসতে বলেছিলাম। জানি না কাদের মেম্বার বলেছে কি না। তবে কাদের মেম্বার এরূপভাবে জানালেন, "সাইনবোর্ড থাকলে ওনারা নামাজে আসবেন না"। সময় কাহারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময় হলে যখন মুসল্লিগণ নামাজ আদায় করে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরলেন। আমরাও নিজ ঘরে ফিরে আসলাম। তখন তেনারা এ সুযোগে জোরপূর্বক সাইনবোর্ডটি উপড়াইয়া ফেললেন। আরও এরূপভাবে প্রকাশ করলেন যে, 'আমরা মসজিদ দখল করিয়া লইলাম'।

শান্ত পরিবেশ অশান্ত করল। প্রবল হতে প্রবলতর বিশৃঙ্খলা এত মাথা চারা দিল যে, দুই দলের জনমতকে একত্র করে সমঝোতায় আনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল। তখন হয় মসজিদ পৃথক, না হয় একত্রে পুরাতন মসজিদে উপস্থিত থাকলে বাকবিতন্ডা হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে। কোনমতে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে, অনিচ্ছাকৃতভাবে পরের জুম্মার দিন পুরাতন মসজিদ হতে সরে গিয়ে নতুনভাবে তাম্বু লটকিয়ে মসজিদ ঘোষণা দিয়ে জুম্মার নামাজ আদায় করা হয়। প্রথম জুম্মার আযান দেন পীরজাদা শাহ্ মোঃ আব্দুল মান্নান ও ইমামতিসহ যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন পীরজাদা ডাঃ শাহ্ মোঃ জোবায়ের হোসেন। মনে হলো, সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। যেহেতু, উনারা উনাদের দাবিকৃত মসজিদ ভবনের জায়গাটি বিনা আয়েশে পেয়ে গেলেন, আমরাও আমাদের নির্মিত মসজিদ অট্টালিকাটি নিরবে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সামাজিকভাবে জনসমর্থন না পেয়ে এহেন পরিস্থিতিকে অসম্মানজনক মনে করে সংঘাতের জের আজও চলে আসছে।

বিস্তারিত জানবার জন্য পরবর্তী প্রজন্ম ও বর্তমান সমাজকে অবহিত করার লক্ষ্যে মসজিদ সমাচার বইটি সম্পূর্ণ এক নজর দেখুন বলে অনুরোধ করলাম।

গ্রন্থকার।

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহিম

দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শারীরিক অযোগ্যতার মধ্যেও কিছু কথা লিখতে বসেছি: যা এই পোড়া দুটি চোখে স্বয়ং দেখেছি, নিজ কানে শুনেছি এবং নিজ কর্মজীবনে বাস্তবায়িত করেছি তা আমার দৈনিক রোজনামচা থেকে সংকলন মাত্র।

অনেকদিন আগের কথা, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞা পবিত্র মাজার ও মসজিদের দান বাক্সটি নিয়ন্ত্রণ করতেন। এর পূর্বে তাহার বাবা আলহাজ্ব শাহ্ সূফী তোজাম্মেল হোসেন পীরসাহেব দান বাক্সটি নিয়ন্ত্রণ করতেন। এক পর্যায়ে আলহাজ্ব শাহ্ সূফী মোজাম্মেল হক পীরসাহেব দান বাক্সের আয় ও ব্যয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করলে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞা বলেন যে, মোহাম্মদ আব্দুছ ছালাম বেলু সাহেব ও বড় ভাইকে বাবাজী বিভিন্ন আয়ের উৎস করে দিয়ে তাদের স্বচ্ছলতার পথ সুগম করেছেন; আমার একটু অভ্যাস গুল খাওয়া, তাই বাবাজী আমাকে দান বাক্সের চাবি দিয়েছেন। তখন হাজী সাহেব (মোজাম্মেল হক) প্রায় প্রতি জুম'আর দিনে মসজিদ ও মাজারের সংস্করণের জন্য মুসল্লিদের কাছে সাহায্যের আবেদন করতেন এবং দুই রাকাত করে নফল নামাজ আদায় করতে বলতেন ।

তেমন ভাল একটা সাড়া না পেয়ে মাজারের পশ্চাতে দক্ষিণপুর্ব দিকে আর একটি দানবাক্স সর্বদলীয় নাম দিয়ে চালু করেন। সামান্য কিছু তহবিলে দেওয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরা অংশগুলো সিমেন্ট লাগিয়ে দেন। এদিকে আহমদ হোসেন মন্টু সাহেব রংপুর-সৈয়দপুর বিশ্বসড়কে পাকারপুল নামক জায়গায় একটি দানবাক্স স্থাপন পূর্বক দেখাশুনা করেন। কিন্তু ঐ দানবাক্সের কোন আয়-ব্যয়ের হিসাব আদৌ পাওয়া যায় নাই।

দীর্ঘদিনের বংশ পরম্পরায় দানবাক্সসহ বিভিন্ন আয়ের কোন জমা খরচের হিসাব পাওয়া যায় নাই এবং তারা উক্ত হিসাবগুলো না দিয়েই গর্ববোধ করেন। এরূপভাবে কাল অতিক্রম করতে থাকলে পুরাতন ইমারতটি বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়ে যায়। এমনকি নামাজ পড়াকালীন কোন কোন সময় ছাদের কিয়দংশ ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। হাজী সাহেব (মোজাম্মেল হক) এতদদর্শনে খুব চিন্তিত ও ব্যস্ত হয়ে বারংবার গ্রামবাসীসহ আওলাদে অলীগণকে আহবান করতে থাকেন কিন্তু কোন সাড়া না পাওয়ায় তিনি কাজটি করতে সক্ষম হন নাই।

একদিন শুক্রবার সফর থেকে বাড়িতে ফেরার সময় রাস্তায় ভেবেছিলাম দ্রুত বাড়িতে পৌছে জুমআর নামাজ আদায় করব। দুর্ভাগ্যবশত যানবাহন জটিলতার কারণে ওকড়াবাড়ীতে পৌছতেই নামাজের সময় হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে সেখানে নামাজ আদায় করে রিকশাযোগে বাড়ি ফিরছিলাম। পথে রিকশাওয়ালা জিজ্ঞাসা

করে, হুজুর বাড়ির কোন খবর জানেন কি? তখন জানিনা বলে উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কী হয়েছে? তখন রিকশাওয়ালা বলতে লাগল, আপনাদের মসজিদ ও মাজারের পুনঃ নির্মাণের জন্য সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর বাড়ি ফিরিলে দেখি মাজার ও মসজিদ ভেঙ্গে মাটির সমান করা হয়েছে।

ভেবেছিলাম কে বা কাহারা এতবড় মহান উদ্যোগ গ্রহণ করলেন বিষয়টি আমাকেও অবগত করা হবে। কিন্তু কার্যত উনারা আমার প্রয়োজনবোধ করেননি। একদিন মাজার শরীফ জিয়ারতে যাচ্ছিলাম, দেখি আমার বড় ভাইজানের আমতলায় বসে কিভাবে কী করা হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সকলে একত্রিত হয়েছেন। হঠাৎ আমাকে দেখে শাহ সুফী মৌলভী জমশেদ আলী সাহেব আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছেন, ভাইয়া তোমাকে বলার সুযোগ না পেয়েই আমরা একটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি; তুমিও বসো। তখন বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্তগুলো শোনার জন্য মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করলাম। এক পর্যায়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী আয়োজনের উপর এতবড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন? উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শাহ সূফী মৌলভী জমশেদ আলী সাহেব বললেন, মাজারের তহবিল হিসাবে মাজারের পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক আমগাছটি ছিল তা বিক্রি করা হয়েছে। মূল্য হয়েছে এক হাজার টাকা মাত্র (১,০০০/-)। মসজিদ ভবনটি ভাঙ্গার পরে যে পুরাতন রড ও বীম ছিল তা বিক্রি করে চব্বিশ হাজার টাকা হয়েছে। এদিকে তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রশিদুল ইসলাম সাহেবের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা, তৎকালীন এম.পি অধ্যাপক হাফিজ সাহেব একটি পাঁচ হাজার টাকার চেক প্রদান করেছেন। এখন বাকি যা প্রয়োজন হবে আওলাদে অলীর সদস্যগণ সাধ্যমত যে যা পারেন তা দিয়ে কাজ করা হবে। কিন্তু কথা হলো 'বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?' কিছুক্ষণ নিরবতার পরে আমি প্রকাশ করলাম, আপনারা পরে মুখ খুলবেন। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব প্রতিশ্রুতি দিয়ে নগদ দশ হাজার টাকা তাৎক্ষণিক আমার বড় ছেলে মুরতুজাকে আনতে বললাম। তখন মোহাম্মদ আব্দুছ ছালাম বেলু সাহেব বললেন, আমিও পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব। আর আপনারা দুই দশ হাজার যে যা পারেন দিয়ে দেন। কিন্তু আমার দেওয়া দশ হাজার টাকা ঐ মিটিংয়ের নগদ টাকা ছিল।

আমার দেওয়া	১০,০০০/-
অধ্যাপক হাফিজ সাহেব	৫,০০০/-
মোঃ রশিদুল চেয়ারম্যান	৫,০০০/-
পুরাতন লোহা বিক্রি	২৪,০০০/-
গাছ বিক্রি	১,০০০/-
তারাগঞ্জ Sub register office	১,৫০০/-
	৪৬,৫০০/-

মোট ছয়চল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র একত্রিত করে আমরা সকলেই ব্যস্ত মানুষ হিসাবে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞাকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে ক্যাশ বুঝিয়ে দিলাম।

এদিকে সকলের প্রস্তাবে আমার মাইক্রোবাসযোগে পরিবারের মোটামুটি মুরব্বিদেরকে সঙ্গে করে অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাদের আশেপাশের গ্রামে সকলকে অবহিত করা হলো। সিদ্ধান্ত হলো উত্তর দিকে মাগুড়া অঞ্চলসহ গ্রামগুলিতে যেনারা যা দিবেন তা মৌলুভী শাহ্ সূফী জমশেদ আলী সাহেবকে দিবেন; তারাগঞ্জ এলাকায় যে যা দিবেন বদরুল আলমকে দিবেন; তারাগঞ্জ Sub register office থেকে শুরু করে ওকড়াবাড়ী/লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত যে যা দিবেন তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞাকে দিবেন। লক্ষ্মীপুরের বছির সরকার Sub-register office এর Collection হইতে দেড় হাজার টাকা মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞার হাতে দিয়াছিলেন। আর কে কোন দিকে কাকে কি দিয়াছেন তাহার কোন হদিস পাওয়া যায় নাই ।

কার্যত কাজ শুরু হলে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞা কিছু বালি, অল্প কিছু ইট ও সিমেন্ট এনে সকলের উপস্থিতিতে ভিত্তি প্রস্তরের কাজ শুরু করেন। ভিত নির্মাণের সময় মিস্ত্রি বলল, ভিতে কিছু সোনা বা রূপা দেওয়া প্রয়োজন আছে। তৎশ্রবণে উপস্থিত সকলে নিরবতা পালন করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আমার স্ত্রী বাড়ি থেকে কাগজে মুড়াইয়া তার একটি কানের স্বর্ণের দুল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এদিয়ে ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ শুরু হয়। সর্বপ্রথম ভিতে মালমসলা দেওয়ার জন্য শাহ্ সূফী মৌলভী জমশেদ আলী সাহেবকে সকলে অনুরোধ করলে তিনি আমাকে প্রথমে মালমসলা দিয়ে কাজের উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ করেন। আমি প্রথম ভিতে মালমসলা দিয়ে উদ্বোধন করি।

কিন্তু এদিকে দেখা গেল চারপাশে ভিত্তির খনন খোড়া হয় কিন্তু পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে কংক্রিট ঢালাই করে বাকি পূর্ব ও উত্তর দিকে বাদ দিয়ে। ঢালাইয়ের উপরের দুই ইট গাঁথুনি করে কাজ বন্ধ করা হয়।

কাজ বন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করলে এরূপভাবে উত্তর আসে যে, সকলের প্রতিশ্রুত টাকাগুলো পেলে পুনরায় কাজ শুরু করা হবে। সকলের পায়ে পায়ে বালুগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সিমেন্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকায় মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞা তা দ্বারা বাড়ির প্লাস্টারের এবং মেরামতের কাজ সমাধা করেন এবং বলেন, "আমার কাছে যে টাকা গচ্ছিত আছে তা ১২-১৪ হাজার টাকা হবে"। পুনরায় কাজ শুরু হলে বালু সিমেন্ট ও ঐ টাকা কাজে লাগান হবে বলে প্রতিশ্রুতি করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন চলে গেলে এবং ভিতের খননের মধ্যে বর্ষাকালীন পানি জমে গেলে তা নদীর মত হয়ে যায়।

পবিত্র মাজার শরীফ ও মসজিদের ভিতরে গরু ও ছাগল এমনকি অবাধে কুকুর প্রবেশ করতে শুরু করে। মনে হয় এটি একটা খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে। বাইরে ছেলেরা খেলতে গেলে তাদের খেলনা মসজিদ ও পবিত্র মাজার শরীফের ভিতরে ঢুকলে ছেলেরা নিজেরা ভিতর থেকে দৌড়ে গিয়ে খেলনা বের করে আনে। এহেন ঐতিহাসিক জহুরিয়া শরীফের পবিত্র মাজার ও মসজিদ এভাবে অবহেলিত অবস্থায় থেকে যায় ।

শাহ্ সূফী মৌঃ জমশেদ আলী দাদাজান একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমি দরিদ্র মানুষ। আমার এমন কোন অর্থ-সম্পত্তি নাই যার দ্বারা আমি এ মহান কাজের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। আমি অনুরোধ করি ও দোয়া করি, তুমি এ দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে কাজটি সমাধা করবে। তখন আমি বলেছিলাম, পীরপরিবারের সকল সদস্যের মতামতের প্রয়োজন আছে। আপনি সকলকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন তিনি কিছু সময় চেয়ে উত্তর দিবেন বলে জানালেন। পরে তিনি অন্য সময় বললেন, তোমার পক্ষেই সম্ভব এ কাজ সমাধা করা। আমি সকলের মতামত যাচাই করে তোমাকে এ অনুরোধ করতেছি। তখন আমি আমার নিজ পরিবার পরিজনের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজটিতে হাত দিলাম। এদিকে তৎকালীন এম.পি অধ্যাপক হাফিজ সাহেব আমার বাড়িতে দাওয়াত খেতে এসে সকল পরিস্থিতি দেখে পাঁচ টন গম ও বিশ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করেন। প্রদত্ত গম ও চেকের দেয় টাকা উত্তোলন করার জন্য আমি সভাপতি হয়ে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র সেক্রেটারী হয়ে কিছু গণ্যমান্য লোককে কমিটির সদস্য করে টাকাটি উত্তোলন করার ব্যবস্থা করলাম। এদিকে শাহ মোঃ আব্দুল মান্নান সাহেব ছয়শত পঁচানব্বই টাকা (৬৯৫/-) জমা দিলেন, মোঃ জুলফিকার হোসেন রাজা মিঞা সাহেব দুই হাজার (২,০০০/-) টাকা জমা দিলেন।

সরকারি দেয় টাকা তোলার সময় বিভিন্ন নিয়ম-কানুন আমার নিজের জানা না থাকায় মুক্তি আফজালের সহযোগিতা গ্রহণ করি। বিনিময়ে তাকে কিছু টাকা দিতে হয়।

এখন আমার কাছে রইলঃ-

এম.পি অধ্যাপক হাফিজ সাহেব	২০,০০০/-
গম	৩৫,০০০/-
মোঃ আব্দুস সালাম বেলু সাহেব	১৭,২১০/-
মোঃ জুলফিকার হোসেন রাজা মিঞা	২,০০০/-
মোঃ আব্দুল মান্নান সাহেব	৬৯৫/-
মোঃ সাইফুল (তেলমনটারী)	৬০/-
মোঃ মোমাজ্জাল (দঃ সিঙ্গেরগাড়ী)	২৬০/-
মোঃ সমবারু (ডাঙ্গাপাড়া)	৩০/-
	মোট ৭৫,২৫৫/- টাকা

অবশিষ্ট মোট টাকা মসজিদ বিষয়ে খরচাদির মাল ছামানার হিসাব করিয়া T.N.O অফিস এবং D.C অফিসে মাস্টার রোল (Master role) সহ যাবতীয় ভাউচারাদী পেশ করা হয়। যার সত্যায়িত নমুনা আজও আমার কাছে রয়েছে। কাজের শুরুতে আমার বড় ভাই পীরজাদা শাহ্ নজরুল ইসলাম সাহেব আমাকে বলেছিলেন, কাজটি বোধহয় ভালো হলো না। ভেবেচিন্তে করা উচিত ছিল। যেহেতু প্রতিষ্ঠানটির জমিজমা ওয়াকফ্ এস্টেটে দেওয়া হয় নাই। তখন সকলে বললেন, প্রতিষ্ঠানতো জহুর বাবার জমির উপর। জহুর বাবার জায়গায় মসজিদ ও মাজার হইবে ইহাতে কাহার কী আপত্তি থাকতে পারে?

বহু ভেবেচিন্তে কাজটি চালু করা হলো। কাজটি চালু করার সময় বগুড়া শিবগঞ্জ থেকে মতলেব মিস্ত্রি ও তার সহযোগী গণকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়। সৈয়দপুরের থ্রি ষ্টার থেকে ইট ক্রয় করলে পরিবহনের জটিলতা বাধে। কোন ট্রাকের ব্যবস্থা করতে না পেরে ভাটায় গিয়ে হতাশ হয়ে চিন্তা করতেছিলাম কী করা যায়। এমন সময় ভাটার ম্যানেজার এসে বললেন, হুজুর ইট নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? তখন আমি পরিবহন সমস্যাটির কথা তাকে জানালাম। তখন তিনি বললেন অদ্য রাত্রে স্বপ্নে আপনাদের পীরকেবলা হযরত শাহ্ সূফী জহুরুল হক (রঃ) স্বয়ং আমাকে বলতেছেন যে, আমার মাজার ও মসজিদের ইট যেন দ্রুত পৌছান হয়। তৎপর ম্যানেজার একথা মালিককে জানালে তেনাদের নিজস্ব বহু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ইট পরিবহন করে দিতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং সুলভে তা দরবার শরীফে পৌছায়ে দেন। এদিকে মসজিদ ও মাজারের চারদিকে চারটি অত্যাধুনিক পিলার ও কারুকার্যখচিত মেহরাব তৈরি করার জন্য সৈয়দপুর হতে non bengali মিস্ত্রী ঈসরাফীল ও তার দলসহ আসলে জানায় যে, এগুলি কাজ করিতে ইটগুলি সাইজ করে নেওয়ার জন্য ২নং ইটের প্রয়োজন হবে। তখন একথা জানতে পারলে তারাগঞ্জের মোঃ বাদশা খাঁ ২নং ইটটি সরবারহ করেন। কাজটি চলতে থাকল।

ইতোমধ্যে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞার কাছে বারংবার পূর্বের তহবিলের টাকা ও গচ্ছিত বালু, সিমেন্টের তাগাদা দিলে এখন না তো তখন ইত্যাদি বলে কাটাতে থাকেন এবং এরূপভাবে প্রচুর সময় কাটিয়ে দেন।

পরে আহাম্মদ হোসেন মন্টু সাহেব, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা সাহেব, মোঃ আব্দুছ ছালাম বেলু সাহেব, মোঃ আবু রায়হান সাহেব, ডাঃ আব্দুর রশীদ সাহেব, রফিকুল ইসলাম বসুনিয়া প্রমুখ গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এককভাবে শামসুল মসজিদ তৈরি করলে আমরা ঐ মসজিদে নামাজ পড়ব না। একথা জানতে পেরে আমি নিজে উনাদেরকে ডেকে বললাম, যদি আপনারা কিছু অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছে পোষণ করেন তা দিতে পারেন। তখন মোহাম্মদ আব্দুছ

ছালাম বেলু সাহেব (১৭,২১০/-) সতের হাজার দুইশত দশ টাকা দিয়ে কাজটিতে অংশ গ্রহণ করেন। পরে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞার কাছে পূর্বের পাওনা টাকা ও বালু সিমেন্টের বারংবার তাগাদা দিলে তিনি উত্তরে বলেন, এক টাকা কয়বার দিতে হয়? এদিকে মোঃ আব্দুস সালাম বেলু সাহেব বলেন আমি মসজিদে অংশগ্রহণ করলাম। অপরদিকে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞা বলেন, ঐ টাকাতো পূর্বের পাওনা পরিশোধের জন্য দেওয়া হয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞার কাছে আর কোন টাকার তাগাদা না দিয়ে কাজটি গাঁথুনি পর্যন্ত সমাপ্ত করা হলো।

এদিকে মসজিদ ও পবিত্র মাজার শরীফের বারান্দা তৈরি করার জন্য ভিত্তি দিতে নিলে উনারা প্রবল বাধা দেন এবং নিজের জায়গা বলে দাবি করেন। তখন আমার শ্রদ্ধেয় ভাইজান বলেন যে, তোমাকে তো পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম, তা তুমি বুঝতে পারলে না।

যাই হোক মসজিদের মুসল্লিবৃন্দ ও আওলাদে অলীর কোন কোন লোকের সহযোগিতায় প্রবল বাধা অতিক্রম করে বারান্দার গাঁথুনির কাজ শেষ করা হলো। এক পর্যায়ে মিস্ত্রিদের সহিত বিতর্ক হতে হতে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেল। উপস্থিত জনগণের হস্তক্ষেপে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে এসেছিল।

এদিকে তারা ভিতরে ভিতরে তুষের অনলের ন্যায় ক্ষোভ ও অভিমানে জ্বলে উঠতে থাকল। অবশেষে জানা গেল তুমি যেহেতু গাঁথুনি করলে ছাদের কাজটা আমরা করব। কারণ তা না হলে আমাদের সমঅধিকার থাকবে না। আমি সহজেই প্রস্তাবটি মেনে নিয়ে কাজটি স্থগিত করে দিলাম।

সুদীর্ঘ ১৯৯৬ সাল হতে ২০০২ সাল পর্যন্ত কাজটি নির্মাণের কোন উদ্যোগ না দেখে আমি হজ্জ যাত্রাকালীন সম্মানিত মুসল্লিগণের কাছে ও পীরবাবার আওলাদগণের কাছে অনুরোধ জানালাম যে, হজ্জ যাওয়ার পূর্বে মসজিদটির কাজ সমাপ্ত দেখতে পারলাম না। যদি আল্লাহ ফিরে আনেন, তাহলে ফিরে এসে মসজিদটির কাজে পুনরায় হাত দিব। তা না হলে আমার অবর্তমানে আমার সন্তানগণকে অসিয়ত করে যাচ্ছি যে, প্রয়োজনে তোমরা আমার সম্পত্তি বিক্রি করে এ কাজটি করে দিবে।

আমার হজ্জ যাওয়ার পূর্বে আমি ষ্ট্রোক করেছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে ঐ অবস্থায় আমি পবিত্র হজব্রত পালন করতে গেলে পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জেমায় পৌছার সাথে সাথে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে যাই এবং আমি হজ্জের যাবতীয় কার্যকলাপ স্বাচ্ছন্দে পরিচালনা করতে সক্ষম হই। দেখতে দেখতে হজ্জের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে পবিত্র মদীনা মনোয়ারা হতে এই আরজিটি

সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ইমামুল ক্বিবলাতাইন জনাব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাক রওজায় জানালাম এবং দেশে ফিরে আসলাম।

আবারো সম্মানিত মুসল্লিগণ ও আওলাদে অলীগণকে বলতে থাকলাম স্থগিত কাজটি সকলের অনুমতি পেলে আমি পুনরায় কাজটি চালু করব। ইচ্ছা থাকলে আপনারাও অংশগ্রহণ করতে পারেন অথবা কায়িক সহযোগিতা দিতে পারেন। পরপর কয়েক জুমআ এরূপ আলোচনা হলে মোহাম্মদ আবেদ আলী নামক জনৈক মুসল্লি বলতে থাকলেন যে, ইনি যে প্রস্তাবটি রাখেন তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না কেন? তখন আহাম্মদ হোসেন মন্টু সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে জানান যে, "তোমাকে এ পঁচা কথাটি বলার জন্য কে অনুমতি দিয়েছে? তখন মুসল্লিদের মধ্যে গুঞ্জন ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। উপস্থিত মুসল্লিগণ বলতে থাকলেন, 'হুজুর আমরা কয়েক বছর দেখেছি অবশিষ্ট কাজটি ক্ষান্ত করে দেওয়া হয়েছে মাত্র কিন্তু সমাপ্ত করার কোন আলামত তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নাই। আপনি যদি সদয় হৃদয়ে কাজটি চালু করেন তাহলে আমরা আর্থিক সহযোগিতা করতে না পারলেও মানসিক সহযোগিতা করব। এই মর্মে আপনি চালু করেন, কে কী বলেন/ করেন আমরা দেখে নিব।"

সকলের সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়ে আমি নয় টন বিভিন্ন সাইজের রড, প্রায় ৫০০ বস্তা সিমেন্ট, ৬০০ সিএফটি পাটগ্রামের বালু, প্রায় ১৩০০ সিএফটি লোকাল বালু, পূর্বের কেনা ২২০০০ পিকেট ও পরে তারাগঞ্জের মমতাজ আড়ৎদার, তোফাজ্জল মিঞা ও মাহাতাবসহ আমার স্থানীয় মুরিদ মোতাকেদগণের সহযোগিতায় বাকি ৬০০০ পিকেট কিনে মজুদ করলাম। এতে সারাদেশব্যাপী আমার মুরিদ মোতাকেদগণ ক্ষীণ সহযোগিতা করলে কমপক্ষে সাটারিংয়ের কাজটি করতে সক্ষম হই। আমার নিজ উদ্যোগে মিস্ত্রি খরচটি, বালু ও পূর্বের ২২০০০ ইট ক্রয় করা হয়। সিরাজগঞ্জের মুরিদগণ বিশেষ করে জনাব গোলাম মওলা খান বাবলু, মোঃ বাবলু খলিফা ও মোঃ মোকাদ্দেছ হোসেনের বৃহৎ সহযোগিতায় কাজটি করতে সক্ষম হই।

কাজটি শুরু করার পূর্বে গ্রামের সমাজের লোকজনকে ও আওলাদে অলীগণকে পরপর পাঁচটি মিটিংয়ে আহবান করে তেনাদের কাছে সার্বিকভাবে সাহায্যের আবেদন জানাই। কিন্তু কোন মিটিংয়েই আওলাদে অলীগণ উপস্থিত হন নাই। তবে শেষ মিটিংয়ে সকল আওলাদগণের পক্ষে আহাম্মদ হোসেন মন্টু সাহেবকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন কিন্তু তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে নীরব থেকে স্লিপিং পার্টনারের পরিচয় দেন। মূলতঃ কাজটিতে আর্থিক সহযোগিতা না থাকলেও তেনাদের মানসিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। মসজিদ ও পবিত্র মাজার শরীফ ৮ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত। মসজিদের

জন্য ১৬ শতাংশ জমি ছিল এবং নতুন রেকর্ডভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ইহার কোন ওয়াকফ্ দলিলাদি ছিল না।

মসজিদের নামে পরিচিত জায়গাটিতে বিভিন্ন বৃক্ষ দ্বারা সবুজ বেষ্টনীতে ঘেরা ছিল। কিন্তু এদিকে ইমারত প্রকৌশলী জানান যে, গাছগুলো কেটে না ফেললে পূর্বের ইমারতটি যেরূপভাবে ধ্বংস হয়েছে এটাও খুব শিগ্‌গিরই নষ্ট হয়ে যাবে। একথা জানালে উনারা বিভিন্ন সূত্রে জানান, গাছ কাটতে দেওয়া হবে না, লোহাতে মরিচা (জাঙ্গ) ধরানো হবে। মসজিদ ও মাজারের পার্টিশন ওয়াল শিমুল গাছের শিকড়ের চাপে ফেটে গিয়েছিল। তখন মুসল্লিদের মধ্যে সকলেই উত্তেজিত হয়ে গাছ কাটায় উদ্যত হয়। তখন আমি সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করলাম। বিষয়টি ভেবে দেখলাম অবাঞ্ছিতভাবে একটি হট্টগোল করে এই মহৎ কাজটি হয়তো আর হবে না। তাই আমি ঘোষণা দিলাম যে, 'আমার ছাদ করে দেওয়ার কথা ছিল তা আমি করে দিব আর রক্ষা করার দায়-দায়িত্ব আপনাদের সকলের, আপনারা গাছ কাটেন আর না কাটেন আমি কাজটি করে দেব।' এই বলে সকলকে ক্ষান্ত করলে ডাঃ আব্দুর রশীদ পরে জানান যে, আমার 'মা' কে জহুর বাবার মাজার সংলগ্ন কবর দিলে আমি গাছ কাটিব। তখন তাকে বহু অনুরোধ করে বুঝায়ে বললাম যে, যে জায়গাটি আপনি চাচ্ছেন উহা ভক্তবৃন্দের জন্য বসে জিয়ারতের জন্য নির্ধারিত স্থান বরং আপনি যদি সম্মতি দেন তাহলে পশ্চিম দেওয়াল সংলগ্ন যে মহিলাদের জিয়ারতের জন্য আলাদা একটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে, সেই জায়গায় আপনার মাকে এবং শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রঃ) এর কনিষ্ঠপুত্র আফতাবুজ্জামান সাহেবকে জায়গা দেওয়া হবে।

এতে ডাঃ আব্দুর রশীদ সাহেব সম্মতি দিলে কিছু গাছ কেটে ফেলেন। তবে যতগুলো গাছ কাটার কথা ছিল তা না কেটে কিছু ডালপালা কেটে ফেলেন। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাজটি শুরু হলে মাজার ও মসজিদের মেঝেতে বালু ফেলানোর জন্য বোরিং করে মেশিনের সাহায্যে বালু উত্তোলন করে মাজার শরীফ ও মসজিদে দেওয়া হয়। কিন্তু শুধু বালু তো যায় না সাথে কিছু পানিও যেত। পানিগুলো নিষ্কাশন করে পার্শ্ববর্তী ডাঃ আঃ রশীদ সাহেবের পুকুরে ফেলান হয়। তখন ডাঃ সাহেব কোন এক কালো হাতের ইঙ্গিতে পুকুরে পানি ফেলতে নিষেধ করলেন। বাধ্য হয়ে পানিগুলো পুকুরে না ফেলে বিকল্প ড্রেন তৈরি করে অনেক দূরে আমার একটি সরিষা ক্ষেতের মধ্যে পানি পৌছিয়ে দেই। এতে সরিষা ক্ষেতটি মরে গিয়েছিল।

তারপরেও আমি উদ্যোম না কমিয়ে কাজটি বন্ধ না করে চালাতে লাগলাম। কিন্তু একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল এই কাজে পূর্বে ও পরে যদিও তেনারা আর্থিক সহযোগিতা করে নাই কিন্তু নিজ নিজ ভক্তদের বাড়িতে মাজার ও

মসজিদের দোহাই দিয়ে Collection করতে ত্রুটি করেননি। বিষয়টি জানতে পারলে আমি নিম্নরূপভাবে একটি সাইনবোর্ড দিয়ে দাতাগণের কাছে আবেদন জানাই।

(ছবির অধ্যায়ে সাইন বোর্ডের ছবিটি দেখুন)

এই সাইনবোর্ড দর্শনে তেনারা সচেতন মুরিদ দ্বারা জবাবদিহিমূলক পরিস্থিতির শিকার হয়ে যান এবং ভিতরে ভিতরে তুষের অনলের মত জ্বলতে থাকেন। তবে এ সাইনবোর্ড দেওয়া অবস্থায় পাঁচ মাস কোন অভিযোগ উত্থাপন না করে সকলে নীরবে নামাজ পড়তে থাকেন। ছাদ ঢালাইয়ের পর বেশ কয়েকটি খুঁটি কে বা কারা চুরি করেছিল। উনাদের বাড়িতে প্রবেশের জন্য রিকশার পথ প্রশস্থ করতে কয়েকটি খুঁটি খুলে ফেললে মুসল্লিদের সাথে বাক-বিতন্ডা হয়। সেদিন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ মুহাঃ গোলাম মুরতুজা আজিজি বলল, মোহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞাকে সম্বোধন করে, "দাদা এতবড় একটি মহৎ কাজ করার সময় আপনারা একটু শখ করেও মাথা ঘুরে তাকালেন না। তদুত্তরে বাদশা মিঞা বলেন,"তোমাদের কাজ নাই তোমরা সারাদিন বসে বসে দেখ, আমাদের অত দেখার প্রয়োজন নাই।"

এদিকে ছাদ ঢালাইয়ের বালু ফেলানোর সময় আওলাদে অলী জনাব আফতাবুজ্জামান সাহেব বলেন যে, আমার জায়গায় বালু ফেলতে দিব না। তখন আমি বললাম, "দাদা একি আপনার বাবার মাজার না আমার বাবার মাজার? বিভিন্ন রকম বুঝ দিলে তিনি সাময়িকভাবে শান্ত হলেন এবং একপ্রকার জোর পূর্বক বালু ফেলা হলো।

এদিকে রড সাটারিং সেন্টারিং কমপ্লিট হলে সিমেন্টের আযোজন করতে কিছু বিলম্ব হয়ে যায়। এই সুযোগে হযরত শাহ্ জহুরুল হক (রঃ)এর পৌত্রাদি এরূপভাবে প্রচার করতে থাকেন যে, ওখানে সিম/ লাউয়ের জাংলা তৈরি করা হবে এবং ঐ গ্রুপের অনেকেই প্রকাশ্যে বলতে শুরু করলেন যে, আমরা এমন এক চাল চেলেছি কোন কালেও ছাদ ঢালাই হবে না। এদিকে প্রায় প্রতিদিন দু/ তিনটি করে খুঁটি চুরি যচ্ছিল। আমি তা নীরবে সহ্য করে খুঁটি রক্ষার জন্য Night guard মৃত মোচন উদ্দিনের পুত্র আব্দুল বারিককে এক মাসের জন্য ঠিক করে দেই।

আমার হাতে দুটি দান বাক্স ভেঙ্গে একটি নির্মাণ করে আমার নিজ দায়িত্বে রাখি কিন্ত আট বছরের মধ্যে ৭০টি মূল্যবান তালা ভেঙ্গে পীরবাবার আওলাদগণের অবহেলায় কে বা কাহারা রাতের অন্ধকারে টাকা লুট করে কাজের বিঘ্ন ঘটায়। এমতাবস্থায়ও আট বছরে প্রায় ২৬,০০০/- টাকা জমে ছিল। কিন্ত

বিগত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসে মাজার শরীফ ও মসজিদের দানবাক্সসহ বিশ্বসড়কের দানবাক্সের কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলতে বাধ্য হই। আমাদের সমাজের মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি আমাদের পূর্বের যুগে নাকি আমাদের সমাজের যাবতীয় সামাজিক ব্যবস্থা একত্রে হইত। এমন কি গ্রামে বিভিন্ন মহৎ শ্রেণীর লোকের হাতে বিভিন্ন রকম দায়-দায়িত্ব ছিল। কোন কোন সময় তৎসময়ের পীর পরিবারের কোন কোন মুরুব্বীদের মধ্যে সমাজের এই নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতেন, ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়ে সমাজে ভাঙ্গন শুরু হল। তৎসময়ে আমাদের সমাজে একটা নিজস্ব ঈদগাহ মাঠ ছিল। জমিটি মৌখিক দান করা ছিল। কিন্তু ওয়াকফ্ দলিল ছিল না এই মর্মে সমাজে এ কথা প্রচার করল যে, দলিল বিহীন মাঠে নামাজ যায়েজ হবে না। কারণ মাঠের জমিটি ওয়াকফ্ করিয়া দেওয়া হয় নাই। এই মর্মে সমাজটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ৫টি জামাতে পরিণত হয়। তারাবীহ সহ ঈদের নামাজ বিভিন্ন জন ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন মাঠে পড়তে থাকলেন। হযরত শাহ্ সূফী জহুরুল হক (রঃ) বাবার কনিষ্ঠ পুত্র জনাব মোহাম্মদ আফতাবুজ্জামান সাহেব ও আব্দুছ ছালাম বেলু সাহেব আমাদের সমাজে শামীল হয়ে ঈদের নামাজ পড়তেন না। তবে ছালাম সাহেবের আব্বা আলহাজ্ব শাহ্ সূফী তোজাম্মেল হোসেন সাহেব, আলহাজ্ব শাহ্ মোজাম্মেল হক সাহেব, মৌঃ শাহ্ সূফী জমশেদ আলী সাহেবসহ পীর পরিবারের সকল সদস্য জহুরিয়া শরীফ ঈদগাহ মাঠে দুই ঈদের নামাজ আদায় করতেন।

এদিকে সমাজের লোককে ওয়াকফের দোহাই দিয়ে প্রতারণা করল। কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই গ্রামের কিছুসংখ্যক লোকের সহিত জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদে মারামারি অবশেষে মামলা পর্যন্ত পৌছে যায়। তখন চাচা আলহাজ্ব তোজাম্মেল হোসেন (রঃ) সাহেব ভাতিজা শাহ্ সূফী আব্দুল আজিজ (রঃ) সাহেবকে বললেন, বাবা চোরদের সাথে সমাজ করা যাবে না। নামাজে ছালাম দিলে ডানে চোর, বায়ে চোর, সামনের কাতারে চোর ও পিছনের কাতারে চোর। এই যুক্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন আমরা পুরাতন বড় মাঠে নামাজ পড়ব। এখানে কাহার সহিত সমাজ করবে? এই ভাবে পরপর দুইটি ঈদ এর নামাজ পুরাতন বড় ঈদগাহ মাঠে পড়া হয়। সেখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল সেখানকার নির্ধারিত ইমাম সাহেব আওলাদে অলী হিসাবে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন নাই। এমন কি দোয়া খায়ের কোনোটাতেই আহবান করতেন না। কারণ মরহুম আউয়াল মুন্সী সাহেবের ইমামতি স্বত্ব লোপ পেয়ে যাবে। এতে আবার চাচাজান আলহাজ্ব তোজাম্মেল হোসেন (রঃ) সাহেব, ভাতিজা শাহ্ আব্দুল আজিজ (রঃ) কে ডেকে

বুঝালেন যে, আমরা আমাদের পূর্বের মাঠেই নামাজ পড়িব; কারণ তেনারা যে অপমান বোধ করেছিলেন সেজন্যই আবারো নিজ মাঠে ফিরে আসলেন।

আবারো গ্রামের লোকজনকে সংগঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমাজের লোকজন বিভিন্ন সময়ে একই মুখে বিভিন্ন কথা হওয়ার কারনে আর ফিরিয়া আসিলেন না। এমন অবস্থায় মসজিদে তারাবীর নামাজ জামাতের সহিত হত না। ওয়াক্তিয়া নামাজে ২/৪ জন মুছল্লি অর্থাৎ পীরপরিবারের লোকজন কেউ কারো অধীনস্ত স্বীকার না করায় নিজে ছোট ছোট সুরে আযান দিয়ে একা একা নামাজ পড়ে যেতেন। আমরা বাড়িতে থাকলে চার পাঁচ জন মিলে তারাবীর নামাজ আদায় করতাম।

পীরজাদাগণের অনুপস্থিতিতে কোন কোন সময় ইমাম মুয়াজ্জিনের অভাবে আযানটি পর্যন্ত হত না। এহেনও মহান অলীর দরবারে নিজ কায়েমী স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য আমাদের সামাজিক অবস্থাটা একটা বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়ে গেল। বহিঃ সমাজে যাহা জবাবদিহিমূলক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

আমাদের এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করে আমি ও আমার বড় ভাইজান শাহ্ নজরুল ইসলাম সাহেবের সহযোগিতায় গ্রামের লোকের বাড়িবাড়ি রাতের অন্ধকারে গিয়ে বুঝাতে শুরু করি যে, এহেন মহান অলীর আমরা প্রতিবেশী অথচ কাহারও কাহারও অপরাধের কারণে মহান অলীর উপর অভিমানী হয়ে সমাজে যে ভাঙ্গন ধরেছে আমরা তা চাই না। আমরা অনুরোধ করি যে, আমরা পুনরায় একত্রিত হয়ে যাবতীয় সামাজিক কার্যকলাপ এক সমাজভুক্ত হয়ে করব। এতে যা দায়-দায়িত্ব তা আমি গ্রহণ করব। সমাজের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রস্তাবটিকে সম্মতি দিয়ে পুনরায় সকলে মিলে একত্রে জামায়াত চালু করা হলো। এভাবে আমার হস্তক্ষেপে সামাজিক যাবতীয় কার্যসহ মসজিদের সংস্কারমূলক উন্নয়ন ঘটতে লাগল। নতুন ইমাম নিযুক্ত হল মরহুম বদিউদ্দিনের পুত্র মোঃ আফজাল মুন্সী সাহেব ও পরে উত্তর সিঙ্গের গাড়ীর আব্দুল ওয়াহেদের পুত্র মোঃ আলম মৌলুভী সাহেব।

মৌলুভী সাহেব মাদ্রাসায় চাকুরি করতেন। মাদ্রাসার কাজের জন্য তাকে মাদ্রাসা কমিটির নির্দেশে ঢাকা যেতে হয়েছিল। ঢাকা যাওয়ার কারণে জুমআর দিন ইমাম সাহেব না থাকায় আমি সম্মানীত মুসল্লিদের জানালাম, আজ তো ইমাম সাহেব নাই, মুসল্লিদের মধ্যে কোন একজন জানা লোককে দিয়ে আজকার ইমামতি পরিচালনা করা হউক। তখন জনাব মোহাম্মদ আফতাবুজ্জামান সাহেব বললেন, "টাইটেল বাবাজীকে বাড়ি হইতে ডাকিয়া আনা হউক"। তখন টাইটেল বাবাজী অর্থাৎ মোঃ আব্দুল ছালাম বেলু সাহেব বাড়িতে ছিলেন না। জবান উদ্দিন নামক জনৈক একজন মুছল্লি বললেন, উপস্থিত মুছল্লিদের মধ্যে যথেষ্ট

জানেওয়ালা লোক আছেন। আপনার চোখে কাউকে পড়িল না। টাইটেল বাবাজীতো কোদাল ঘাড়ে নিয়ে ক্ষেতের মাঠে কর্দমাক্ত অবস্থায় ঘুরতেছে। তখন জনতার মাঝে উষ্ণ কানাঘুষা চলছিল। কোন রকমে অসময়ে জামায়াতের কাজটি সেদিনের মত শেষ করা হলো।

প্রসঙ্গগত আরো একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারি না। বিগত কয়েক বৎসর আগে আমার বড় ভাই শাহ্ নজরুল ইসলাম সাহেব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সি.সি.ইউ ক্যাবিনে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ভর্তির ছয় দিন পর। সেদিন ছিল শুক্রবার। ভোরে ভাইজান বললেন, তুমি আজ বাড়ি যাও। বাড়িতে গিয়া জুম'আর সময় উপস্থিত মুছল্লিদের কাছে আমার জন্য দোয়া চেয়ে এক খতম মিলাদ পড়াইও। আমি বাড়িতে পৌঁছে মসজিদে নামাজ আদায় করে প্রস্তাবটি মুছল্লিদের কাছে পেশ করলাম। তখন শোনা মাত্রই মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন "ফট্টাস" করে জায়নামাজ ঝেরে কাঁধে করে বের হয়ে গেলেন। তৎদর্শনে পর্যায়ক্রমে জনাব মোহাম্মদ আফতাবুজ্জামান সাহেব, রাজা মিঞা সাহেব ও তার কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে করে বের হয়ে গেলেন। সাথে সাথে মোহাম্মদ আব্দুছ ছালাম সাহেব, মোঃ আবু রায়হান এভাবে বের হয়ে গেলেন। অবশিষ্ট কয়েকজন জামায়াতের মুছল্লির উপস্থিতিতে মিলাদ শরীফ শেষ করে আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়া কামনা করা হল।

পরবর্তী ২য় শুক্রবার হসপিটাল থেকে ভাইজান একই প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন যে, মুছল্লিদের কাছে আবদার করিও আমার আশু রোগমুক্তির জন্য, যেন দোয়া করে। কিন্ত এতদশ্রবণে পুনরায় ঐ কয়েক ব্যক্তি উঠে গেলেন। কোনরকম আমরা উপস্থিত অবশিষ্ট মুছল্লিসহ দোয়া কামনা করে সেদিনের জুম'আর কাজ শেষ করা হলো। ইতোমধ্যে ভাইজান বাড়ি ফিরেছেন। তৃতীয় শুক্রবারে বাদ জুম'আ উপস্থিত সকল মুছল্লির প্রতি আহবান জানিয়ে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন তার মেয়ের পরীক্ষার দোয়ার জন্য আবদার করলেন। ধান কাটার মৌসুম চলছিল। তখন জনাব মোহাম্মদ আফতাবুজ্জামান সাহেব মিলাদ শুরু করলেন। আমরা সকলে রইলাম। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে মিলাদ শেষ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কাজের লোক; আজ আমার ৩০ জন শ্রমিক ধান কাটার কাজ করছে অথচ আপনি কোনদিকে নজর না দিয়ে প্রচুর সময় নষ্ট করলেন। দুঃখজনক হলেও সত্য মৃত্যুপ্রায় শয্যাশায়ী ভাইজানের আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়ার আহবান করলে আপনারা বিরক্তভরে বের হয়ে চলে যান অথচ আজ পরীক্ষার দোয়ার জন্য এত সময় কাটালেন। তখন মোহাম্মদ আফতাবুজ্জামান সাহেব রেগে উত্তর দিলেন, তুমি মসজিদের কে? আমরা তো গাছের মূল, তুমি তো হলে গাছের লতা-পাতা।

আমরা যা খুশি তাই করব। এরূপ উত্তপ্ত অবস্থায় কিছুটা বাকবিতন্ডার পর মুছল্লিগণ নিজ নিজ কাজে চলে গেলেন।

এরূপভাবে আচরণ করে উনারা ক্রমশই দলভারী হয়ে আমার উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে থাকলেন। যার মূল কারণ ছিল মসজিদের কাজ আমি পুনরায় শুরু করতেছি। এই আভাস পেয়ে আমার বিরোধিতা শুরু করলেন। এমন কি মসজিদের কাজ চলাকালীন একদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না। বিকালে বাড়িতে এসে দেখি আমার প্রতিবেশী ছকমল হোসেন এর নাতী মারা গিয়েছে। জানাজার খবর জানতে পেরে জানাযার মাঠে উপস্থিত হইলাম। তখন মাইয়্যাতের অভিভাবক ইমাম সাহেব ও জনতার সামনে প্রস্তাব পেশ করিলেন যে, যদিও জানাযার হক্ব ইমাম সাহেবের কিন্তু আমি নিয়্যত করিয়াছি, আপনাদের আপত্তি না থাকিলে হুজুরের দ্বারায় জানাযাটি করিতে চাই। এতদশ্রবণে জনতা ও ইমাম সাহেব হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানালেন। তখন আমি জানাযায় ইমামতি করার জন্য প্রস্তুতি নিতেছিলাম। আমাকে খাটলীর সামনে অগ্রসর হতে দেখে জানাযার লাইন হতে ক্ষুব্ধ মনে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞা মাঠ পরিত্যাগ করলেন। জনতার মধ্যে গুঞ্জন সৃষ্টি হলেও বিষয়টি আমি overlook করে চললাম। অথচ তারই অল্প কয়েকদিন পরে আমাদের জামাতের আর একজন মহিলা ব্যক্তির মৃত্যুতে জানাযায় উপস্থিত হলাম। মাইয়্যাতের অভিভাবক ছেলে বলল, মায়ের শেষ ইচ্ছা মোঃ আফতাবুজ্জামান সাহেবের দ্বারায় জানাযাটি যাতে হয়। তিনি জানাযায় উদ্যোত হলেন। যদিও জুতা পায়ে দিয়ে অসংলগ্ন আচরণের সহিত জানাযা আদায় করলেন তথাপি আমরা মাঠ পরিত্যাগ করি নাই।

তার বেশ কিছুদিন পরে আব্দুল জব্বার মাষ্টার সাহেবের জানাযায় মাইয়্যাতের অসিয়ত মোতাবেক মোঃ আফতাবুজ্জামান সাহেবকে জানাযার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনিও উদ্যোত হলেন আমরাও অংশগ্রহণ করলাম। কিন্তু তিনি জানাযা না পড়ে বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। বক্তব্যটি ছিল এরূপ-

"মরদুদ হয়ে যাবে, কাফের হয়ে যাবে,
বেঈমান হয়ে যাবে, শয়তান হয়ে যাবে"।

কাকে কী উদ্দেশ্যে বলছিলেন তা আমাদের বোধগম্যের বাইরে ছিল। তখন আব্দুছ ছালাম বেলু সাহেব বললেন, সামনে মাইকটি দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ও জনতা বললেন, হুজুর কথা রেখে জানাযা পড়ুন। শেষে তিনি অহংকারের সহিত জানাযা শুরু করলেন। তিনি প্রথমে ঈদুল আযহার নামাজ পড়লেন। জনতার মধ্য থেকে অনেকে আল্লাহু আকবার এবং অনেকে আপত্তি উক্তি তুললেন। এতে তিনি ২য় বার সংশোধনী জানাযা শুরু করলেন, তখন তিনি ২য় বার ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করলেন। উপায়ন্তর না পেয়ে কর্তৃপক্ষ মোঃ

আলম মৌলুভীকে জানাযা পরানোর জন্য আহ্বান করলেন। মৌলুভী সাহেব সঠিকভাবে জানাযা আদায় করলেন। আমরা কোন অবস্থায়ই জানাযার মাঠ পরিত্যাগ করি নাই। কিন্তু কথা হলো, যে আলম মৌলুভীর পিছনে নামাজ হারাম বলে পূর্বে আমাদের জামাত থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল আজ সেই মৌলুভীর পিছনে নামাজ আদায় করলেন; বুঝে আসে না।

এদিকে কয়েকদিন পরে এক মহিলার মৃত্যু হয়। মহিলার অভিভাবক ছিলেন উনাদের সমর্থক মাইয়্যাতের অসিয়ত মোতাবেক আমার প্রতি জানাযার নামাজ পড়ানোর অনুরোধ করলে উনারা স্বদলবলে জানাযায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেন।

এখন মসজিদে সকল মুসল্লিদের সমর্থনে কাজ শুরু করলে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত শুরু করে দেয়। কিছুতেই সফলতা আনতে না পেরে তারা চক্রান্তে মেতে উঠলেন। গ্রামের জনগণকে ডেকে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞা ও মুক্তি আফজাল এরূপ উক্তি পেশ করতে থাকলেন যে, 'দূর হয়ে যাও, এটা কি তোমাদের বাবার জায়গা, এখানে তোমাদের কোন কথা বলার অধিকার নাই।' এছাড়া তারা আরো বলেন যে,

"ওয়াকফ্ ছাড়াই নামাজ পড়েন পড়; না পড়েন নাই।"

তোমাদের বাপ দাদা যেভাবে নামাজ পড়িয়াছিল সেইভাবে নামাজ পড়েন পড়, না পড়েন নাই; আমাদের এখানে আপনাদের কোন অধিকার থাকবে না।

"আমরা যাহাদেরকে কোনমতেই প্রয়োজনবোধ করি না তাহাদেরকে "শামসুল" মাথার উপর তুলিয়া দিয়াছে। তবে তোমরা জানিয়া রাখ, মসজিদ নির্মাণ করা যতই সহজ হোক না কেন, শামসুল এককভাবে খরচ করিয়া মসজিদ নির্মাণ করুক কিন্তু জায়গাটি আমাদের।" মূলতঃ জায়গাটি ছিল পীরে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল কুতুবুল ইরশাদ হাদীয়ে জামান হযরত শাহ সুফী জহুরুল হক (রঃ) এর। ইহার চার শতাংশের মধ্যে পবিত্র মাজার শরীফ ও চার শতাংশের মধ্যে পবিত্র মসজিদ অবস্থিত। বাকি আট শতাংশ মসজিদের বিভিন্ন প্রয়োজনে রাখা হয়েছিল। এখন মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা সাহেবের কথা হলো শামসুলের দাদা এক অংশের মালিক আর আমাদের বাপ চাচারা ৭ অংশের মালিক। সুতরাং আমরা ১৪ শতাংশ মাপিয়া লইয়া প্রাচীর দেব, দরজায় তালা লাগিয়ে দেব, তোমরা ২ শতাংশের মধ্যে যা খুশি কর। এখন কথা হলো, ঐ মাজার শরীফের ভিতর রয়েছেন আমার দাদাজান হযরত পাগলা পীর ছমিরউদ্দিন আহমদ (রঃ); তেনার মা আমিরুন্নেছা (রঃ), আমার মা উলফাতুন্নেছা (রঃ), আমার চাচা পীরজাদা হবিবুর রহমান (রঃ) সাহেব। সকলের অধিকারে রহিল

পীরে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, কুতুবুল ইরশাদ, হাদীয়ে জামান হযরত শাহ সুফী জহুরুল হক (রঃ) বাবা। মসজিদে ২ শতাংশ লইলে মাজার হয়ে যায় অন্যের জায়গায়। মাজার লইলে মসজিদ থাকে অন্যের দাবীকৃত জায়গায়। প্রসঙ্গক্রমে উনাদের তরফের জনৈকা মহিলা বলে ফেললেন যে, 'প্রয়োজনে তোমাদের কবরগুলি খুড়িয়া লাশগুলি বাহির করিয়া লইয়া যাও।'

এতদ্বসমস্ত চিন্তা করে উনাদেরকে মসজিদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমরা মাজারের অংশগ্রহণ করলাম। এমতাবস্থায় গ্রামবাসীর মধ্যমপন্থা অবলম্বন করায় পুনরায় স্থানীয় চেয়ারম্যান, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে Minimise করার জন্য Meeting বসল। মিটিং চলাকালীন আমি প্রস্তাব দিলাম, একটা নতুন কমিটি গঠন করা হউক। কমিটির সদস্য আমরা দিব অর্ধেক; উনারা দিবেন অর্ধেক। কথা হয়ে গেল এবং আমরা আমাদের পক্ষের নাম দিয়ে দিলাম, উনাদের সদস্যগণের নাম দিতে বিলম্ব হচ্ছিল। চেয়ারম্যান সাহেব মিটিংয়ে বলেন, Committee-র সদস্য পীরপরিবারের সদস্য হতে পারবে না এবং কোন বেনামাজী ব্যক্তি হতে পারবে না। পরে সদস্যের নাম দিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ জানা গেল এরূপ যে, উনাদের সদস্যগণের মধ্যে কেউ কেউ জীবনে মসজিদে আসে নাই; আল্লাহ বলে কেউ আছেন তা জানেন কিনা সন্দেহ। এজন্য তারা তাদের সদস্যের নাম সম্বলিত কাগজটা পেশ করতে ইতস্তত করছিল। রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে পুনঃবিবেচনার জন্য সদস্যগণের নামগুলো দেখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ করে মোমবাতিটি পরে কাগজটিতে আগুন ধরে যায় এবং শুধুমাত্র মুক্তি আফজালের নামটি পুড়ে যায়। লজ্জায় সংকুচিত হয়ে তারা সকলে চেয়ারম্যানকে বিদায় দিল।

চেয়ারম্যান থাকাকালীন দুই সহোদর ভাই ডাঃ জোবায়ের হোসেন মজনু সাহেব ও মোঃ জুলফিকার আলী রাজা মিয়া সাহেবদ্বয়ের মধ্যে বাগবিতন্ডা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ডাঃ সাহেব চেয়ারম্যানের কাছে সময় নিয়ে কথা বলছিলেন। এমতাবস্থায় ছোটভাই মোঃ জুলফিকার হোসেন রাজা মিঞা সভার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে শয়তান, আবু জেহেল, হারামজাদা ইত্যাদি কটুক্তি করে বড় ভাই ডাঃ জোবায়ের হোসেন মজনু সাহেবকে গালিগালাজ শুরু করলেন। এক পর্যায়ে দু'জনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উপস্থিত জনতা কোনোরকমে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনলেন। তখন চেয়ারম্যান সাহেব আবার অন্য সময়ে আসবেন বলে চলে গেলেন। এদিকে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে আমরাও নিজ নিজ ঘরে ফিরলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তেজিত জনতার মধ্যে হই হই শব্দ শুনে বিষয়টি দেখতে গেলাম। তখন দেখি জনতা বিল্ডিংয়ের সাটারিংয়ের বাঁশ লাঠি হিসাবে হাতে নিয়ে প্রস্তুত। সকলকে জোর হাতে বিনয়ের সুরে থামার জন্য

অনুরোধ করলাম। আরো উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে অনেকের সহযোগিতায় উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আসল। পরে উত্তেজনার কারণ জানতে পারলাম যে, মরহুম ইয়াকুব আলীর পুত্র মোহাম্মদ আপান মিঞাকে আহমদ হোসেন এর পুত্র সিটু মিঞা গলাধাক্কা দিয়েছে।

পরেরদিন ছিল বৃহস্পতিবার। আমরা ভোরে গিয়ে বিষয়টি চেয়ারম্যান সাহেবকে অবহিত করলাম। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, শুক্রবার জুমআর নামাজ পড়ুন, আমি পুনরায় বসে জটিলতার নিরসন করব। ঐ কথা মোতাবেক আমরা নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

চেয়ারম্যানের মিটিং এর পূর্ব ঘটনা

সেদিন ছিল শুক্রবার। তখন সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা। জনতা তখনো মসজিদ প্রাঙ্গণে বসে ভাবছিলেন যে, এখন কী করা যায়? তখন আমি বিষয়টা সহজ করার জন্য তথায় গিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বললাম, আমার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কী করা উচিত আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আমি দান বাক্সের চাবি ও খুঁটি মসজিদে দিয়ে দিব। আমার আবেদনকৃত সাইনবোর্ডটি উঠিয়ে ফেলার জন্য অনুমতি দিলাম। আপনারা যখন খুশি তখন তুলে ফেলতে পারেন। তখন উপস্থিত জনতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, চেয়ারম্যান সাহেব যেহেতু আসতে চেয়েছেন, তখন যাবতীয় কাজ ও দায়িত্ব হস্তান্তর তাঁর উপস্থিতিতে নেয়া হবে। পীর সাহেব দায়িত্ব ছেড়ে দিলে এমতাবস্থায় কাকে দায়িত্ব দেয়া যাবে। সুতরাং বিষয়টির জটিলতা থেকেই যাবে। আজকে এভাবেই নামাজ পড়া হউক। এতদশ্রবণে তখন সালাম সাহেব ও তার সহযোগীগণ নামাজের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুছল্লীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এরূপ বলতে থাকলেন যে "ঐ সাইনবোর্ড থাকলে নামাজ যায়েজ হবে না। আমরা নামাজ পড়িব না, তোমরাও নামাজ পড়িও না" কিন্তু জনমনে তা একবিন্দুও আছর করল না। সময় হলে জোয়ারের ন্যায় দলে দলে লোকজন জামাতে উপস্থিত হচ্ছিল। এরূপ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হতে দেখে 'এ রাস্তা মসজিদের নয়' এরূপ বলে বাধা দেয়ার জন্য লোক নিযুক্ত করল। বিকল্প পথে নামাজ আদায়ের জন্য এসে যখন আমরা মসজিদে নামাজ আদায় করছিলাম তখন উনারা জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞার বাড়ির গেটের কাছে লাঠিসোঠা সহ দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সময় হলে আযান দিয়ে মসজিদে জামাতের সহিত নামাজ আদায় করা হলো এবং নামাজ শেষে মুছল্লিগণ যখন নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেলেন, তখন এই সুযোগে উনারা কিছু সন্ত্রাসীর সহযোগিতায় সাইনবোর্ডটি জোরপূর্বক উপড়াইয়া ফেললেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, 'আমরা আপস মানি না। জায়গা আমাদের, আপস কাহার সহিত করিব'। এই বলে মসজিদ দখল করে নিলেন এবং আরো বললেন, 'ঐ

পুরাতন ভবনের ছাদ ভাঙ্গা অবস্থা। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

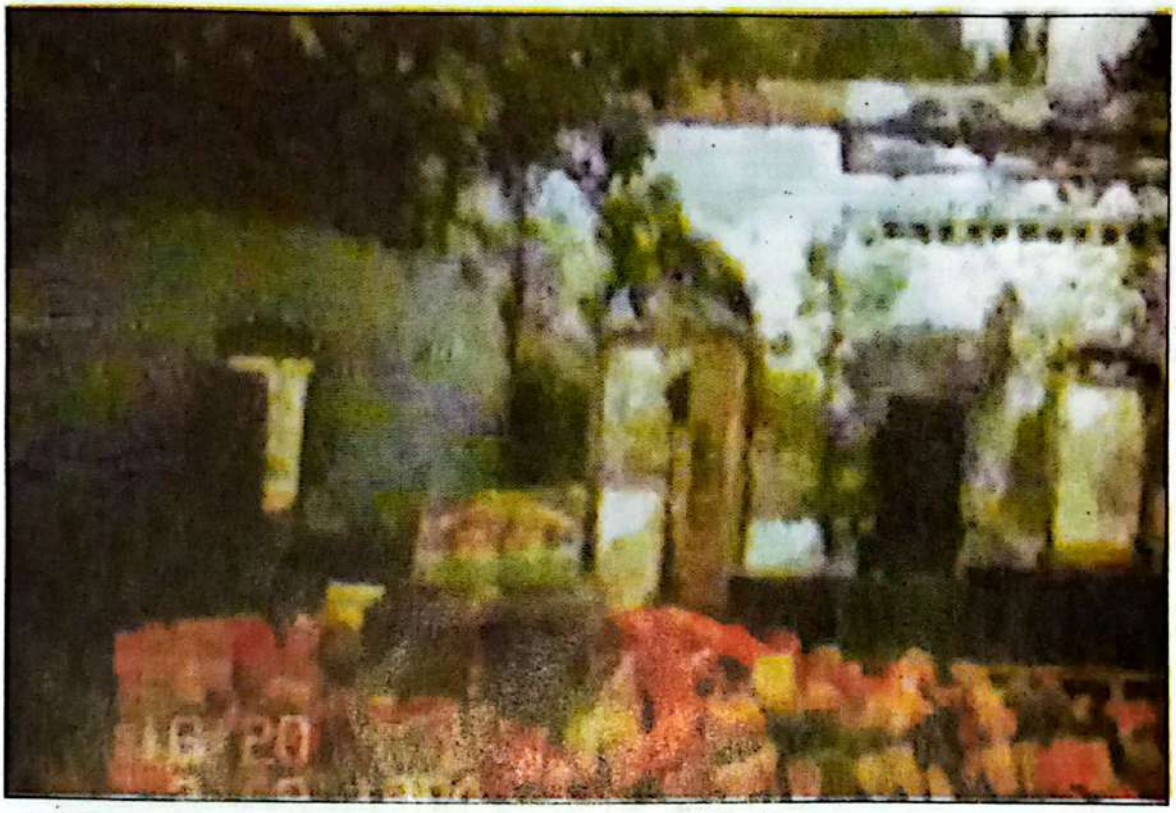

পুরাতন ভবনের পেছনে ভ্রাম্যমান দানবাক্স দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করতেন। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

নতুন মসজিদের ছাদ ঢালাইয়ের দিনে দোয়া অনুষ্ঠান। যাতে জনাব আফতাবুজ্জামান সাহেব উপস্থিত ছিলেন। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

উল্লসিত জনতা আনন্দের সহিত কাজে সহযোগিতা করিতেছে। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

নতুন মসজিদের ছাদ ঢালাইয়ের উদ্বোধনী দৃশ্য। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

পুরাতন মসজিদ ভবনের পিছনের অংশ ও সেই সর্বদলীয় দানবাক্সটি। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন ভবনের কাজ শেষ করে স্থগিত অবস্থা।

পরবর্তীতে নতুন ভবনের কাজ চলাকালীন অবস্থা। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

পুরাতন মসজিদ ভবনের পুরাতন অবস্থায় জিয়ারত করার দৃশ্য ও লিচু গাছটি। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

নতুন ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের সময় ছাদের উপরের অংশ। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

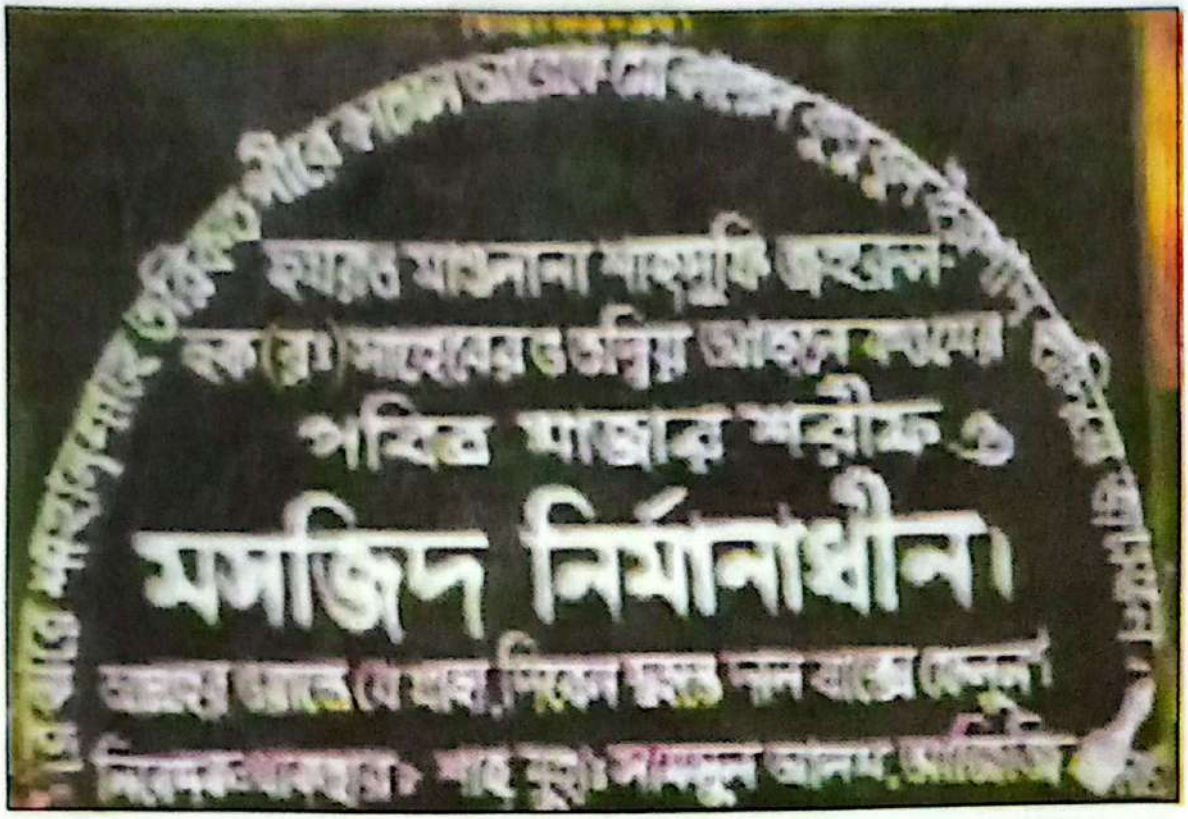

এই সেই আবেদনকৃত সাইনবোর্ডটি।

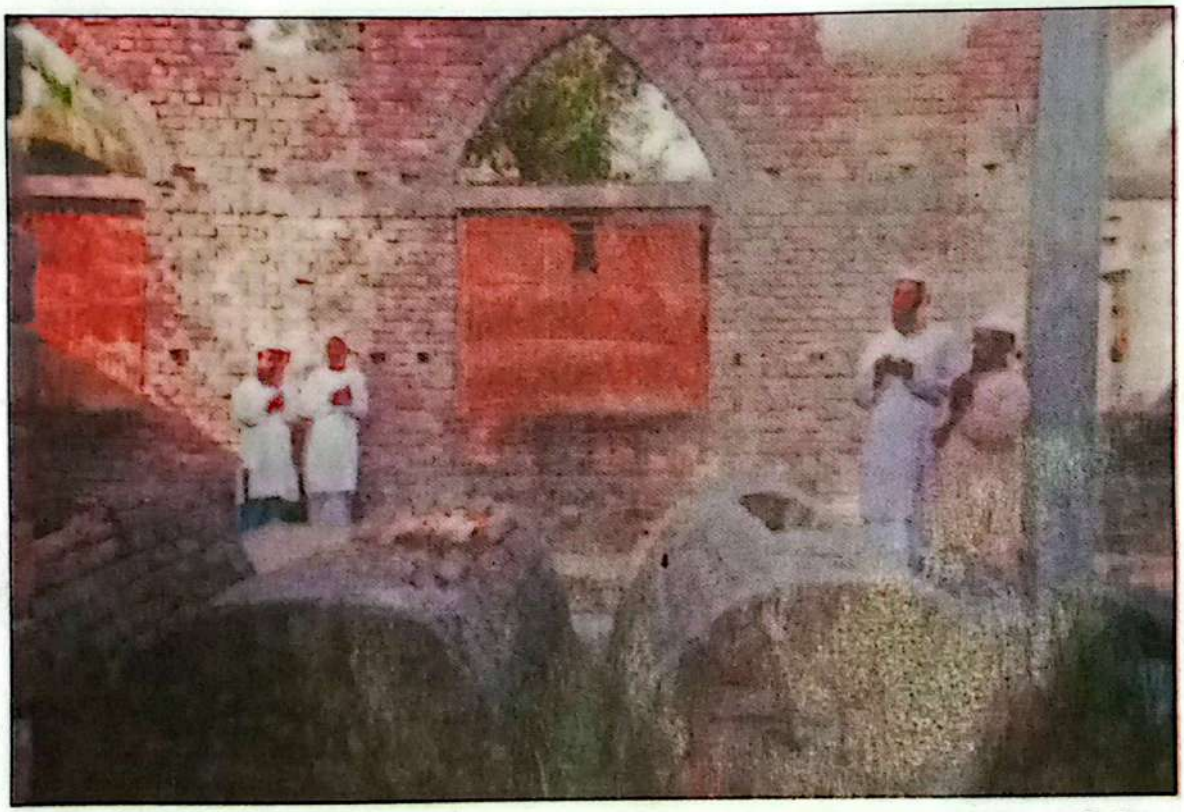

মসজিদ ও মাজার শরীফ সংস্করণের প্রাথমিক পর্যায় ভিতরের অংশ। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

তৎসময়ের পুরাতন মসজিদের সামনের অবস্থা। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

ভ্রাম্যমান মসজিদে পুরাতন মসজিদের কাজ চলাকালীন আবেদনকৃত সাইনবোর্ডটি ঝুলিতেছে। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

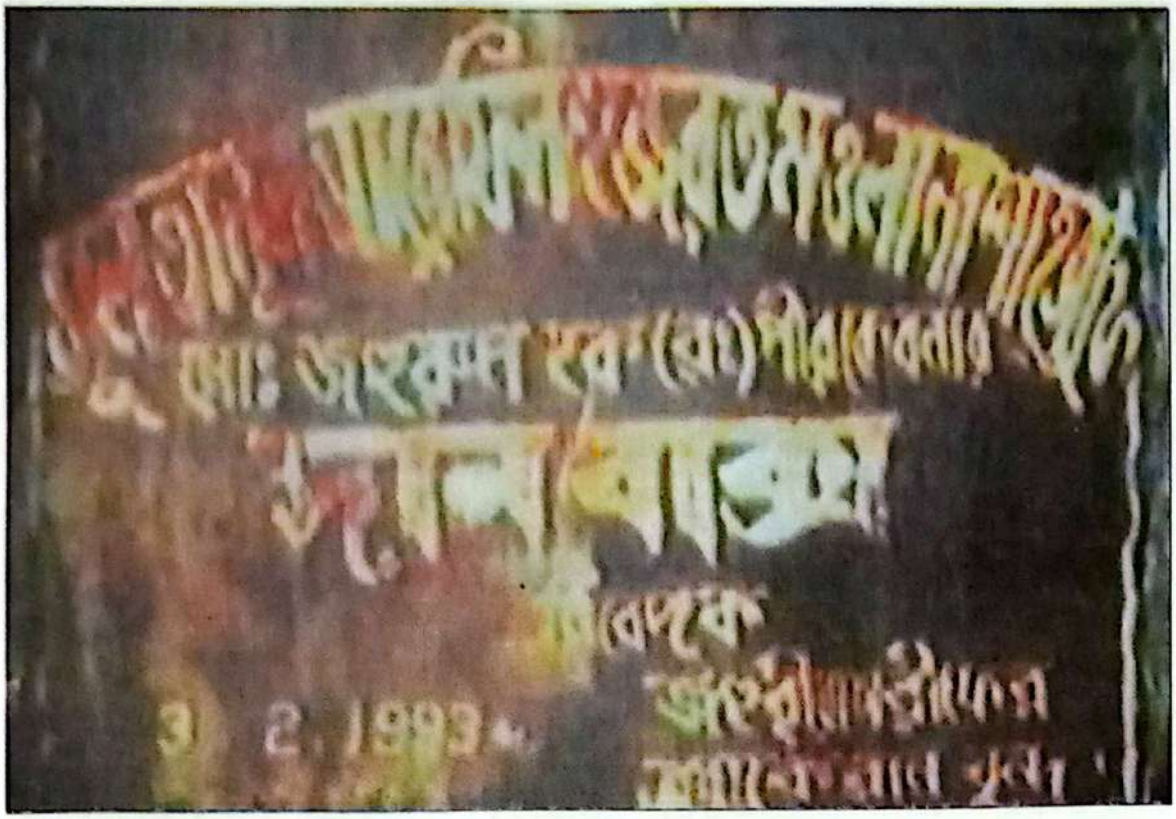

প্রাচীনকালের দানবাক্স। যা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিপক্ষ এককভাবে ব্যবহার করতেন। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

মাজার শরীফের পুরাতন ভগ্নাবশেষ অবস্থা। (ছবিটি ভিডিও ফিল্ম থেকে ধারণকৃত)

সমস্ত পচামুকা দশের আমরা ধার ধারি না। জমি ওয়াকফ করিয়া চায়?' মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন রাজা মিঞা সাহেব এক পর্যায়ে আপান মামুদ, মোমাজ্জাল, মাহাতাব ও মহসীন মাষ্টারকে বলেন, 'ওয়াকফের দলিল তোমাদের পাচার মধ্যে দিয়ে দিব। কার বাবার জমির উপর গিয়া মাতব্বরি করেন? আবার আসিলে উচিৎ শিক্ষা দিব'। তখন জনগণ উত্তেজিত হয়ে আমাকেও ছেড়ে একটা আলাদা মিটিং করল। এতদসমূহের কারণে চেয়ারম্যান সাহেব বিষয়টি নিরসনের জন্য উভয় দলকে একত্র করে মিটিংয়ের আয়োজন করলেন। মিটিংয়ের কাজ অসমাপ্ত রেখে আবারো আসবেন বলে চলে গেলেন। প্রতিপক্ষের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি আর না এসে আমাদের ওয়ার্ডের মেম্বার আব্দুল কাদের সরকারের মাধ্যমে খবর পাঠিয়ে দিলেন, 'আমি এ মসজিদের ব্যাপারে কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিব না। বিষয়টি তোমাদের, তোমরা নিজেরাই ফায়সালা টানিবে'।

তখন গ্রামবাসী মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আমরা বংশ পরম্পরায় বারংবার এরূপভাবে অপমানিত হতে পারব না। শেষ পর্যন্ত কোন কুঘটন-অঘটন ঘটতে পারে। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এ জের থেকেই যাবে। আমাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে। আমরা স্বাধীনচিত্তে উপাসনা করার জন্য অন্যত্র জায়গা লইয়া, সকলের সম অধিকার সৃষ্টি করে সে জায়গায় নামাজ পড়ব। এদিকে গ্রামবাসী সকলে একযোগে আমার বাড়িতে এসে আমাকে বললেন, এখন আপনি কী করবেন? তখন আমি বহু ভেবেচিন্তে বললাম, আপনারা চলে গেলে আমি একা হয়ে থাকব, তখন উনাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে যাব। সুতরাং আপনারা যেখানে যাবেন, আমাকেও নিয়ে যান। অথবা এ মসজিদেই থেকে যান। আমি উভয় অবস্থায় আপনাদের সাথে একমত। তখন জনগণ বলল, আজকে এ পর্যন্ত মূলতবি রেখে আগামীকাল পুনরায় বসা হবে।

পরের দিন যখন তেনারা সমবেতভাবে পুনরায় আমার বাড়িতে আসলেন এবং প্রস্তাব দিলেন যে, হুজুর আমরা বহু ভেবে দেখলাম আপনাকে একা বিপদে ফেলে ও রেখে যাওয়া যাবে না, আর আমাদের সঙ্গে গ্রামের অন্য মাথায় আপনাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ আপনার বাড়িতে দেশ বিদেশ হতে অনেক ভক্ত আসে এবং এজন্য আপনি সমস্যায় পড়বেন।

তখন আমি মুক্তি আফজালের ভাই জিন্নুরকে লক্ষ্য করে বললাম, আমাকে উপরে তুলে আচার দিয়ে ফেলবেন নাতো? যেহেতু তোমার আপন ভাই মুক্তি আফজাল আমার বিরোধীতা করতেছে। তখন জিন্নুর বলল, মুক্তি আফজালের আর খাওয়া নাই, হকারের মত মলম বিক্রি করা লেকচারে আমরা ভুলব না। তখন আমি সময় নিয়ে বললাম, আমার ভাগ-ভাগির সঙ্গে একটু বুঝবার সুযোগ দিন।

ওদিকে উনারা বিভিন্ন হুমকির বুলি আওড়াতে লাগলেন। সকল দিক বিবেচনা করে আমার ভাগ-ভাগিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মাঝখানে যাই এবং সেখানে মুক্তি আফজালকেও ডাকি। কিন্তু সে সেখানে উপস্থিত না হয়ে কটুক্তি করেছে। জনতা উত্তেজিত হয়ে চলে আসেন এবং আমার কাছে আবদার করেন যে, আপনি জায়গা দান করুন, আমরা সেখানেই নামাজ পড়িব এবং জনতা উল্লাসের সহিত আসিয়া আমার একটি জায়গা পছন্দ করে খুঁটি গাড়লেন। অতঃপর জমিটি ওয়াকফ্ করে দিতে অনুরোধ করলেন। তবুও আমি ভাবছিলাম জমিটি ওয়াকফ্ হওয়ার পূর্বে যদি মীমাংসা হয়ে যায়, এই ভেবে কিছুটা গড়িমসি করে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তারা মসজিদে যাওয়ার পথ বন্ধ করে লোক পাহাড়া দিয়ে বলতেছিল, "আমাদের জমির উপর দিয়া মসজিদে যাইতে পারিবেন না।" আরো বলছিলেন, "প্রয়োজনে গ্রামবাসী আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন কিন্তু কোন অধিকার লইয়া নয়। সাধারণভাবে এসে নামাজ পড়ে যাবেন। মসজিদের ব্যাপারে আমরা যা করব সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে এবং সর্বক্ষেত্রে "শামসুলকে" বাদ দিয়ে। আর যদি ওর সঙ্গে থাকেন তাহলে আমরা আমাদের অংশে প্রবেশ করতে দিব না।" এরূপভাবে সপ্তাহ কাল কেটে গেল। জনগণ মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামাজ ছেড়ে দিলে ওনারা সাচ্ছন্দে সকলকে ছেড়ে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করত। শুক্রবার আগত দেখে আমরা চিন্তিত হই ও পুনরায় চেয়ারম্যানের স্মরণ করার জন্য মেম্বারকে পাঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলে মেম্বার বলল যে, আমি চেয়ারম্যানকে বিষয়টি ভাবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি পূর্বের ন্যায় একই কথা বলছেন। সুতরাং চেয়ারম্যানের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না।

আমরা নুতন মসজিদে দ্বিতীয় জুমার দিন জোয়ারের ন্যায় মুসল্লীর আগমনে নামাজ আদায় করলাম। তখন উনারা কিছু মাস্তান ও ভাড়াটিয়া মুছল্লী সংগ্রহ করে পুরাতন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করত। শুধুমাত্র মাস্তান ও আর সন্ত্রাসী নিয়ে নামাজ আদায় করতে করতে ওদের মাথায় নতুন ষড়যন্ত্রের চাকা ঘুরতে লাগল। হাটবাজারে চায়ের দোকান রিজার্ভ করে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মুসল্লী সংগ্রহ করতে লাগলেন। কিন্তু ইসলাম শান্তির ধর্ম, লোভ বা ভয়-ভীতি দেখিয়ে কোনদিন মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। হতাশা, মানসিক দুর্বলতা নিয়ে ভিন্নপথ অবলম্বন করল। আমাদের জামাতের মুছল্লিগণকে বিভিন্ন ভীতি প্রদর্শন করতে শুরু করল। এমনকি চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় বিভিন্ন দানগুলো বন্ধ করে দিল। V.G.F কার্ডসহ বয়স্কভাতা আমাদের মুছল্লিদের মধ্যে যারা ন্যায্য পাওনাদার তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র উনাদের সমর্থকদেরকে বিতরণ করল। কিন্তু যখন বুঝতে পারল যে, একেবারে কাউকে কিছু না দিলে কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহিমূলক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যাবেন। এসবকিছু চিন্তা করে পরে কাউকে কাউকে কিছু বয়স্কভাতা

ও V.G.F কার্ড দিয়ে শোধরানোর চেষ্টা করেন। তবে উত্তেজিত মুহূর্তে আমাদের জনগণকে কিছুই দেওয়া হয়নি। এত সবকিছু বেলু সাহেবের নেতৃত্বে হয়েছে। বর্তমানে আমাদের সমাজটা প্রায় ২০০ পরিবার নিয়ে গঠিত এবং ওনাদের সমাজে প্রায় ২০টি পরিবার রয়েছে। আমাদের সমাজে লোকও বেশি, দরিদ্র এবং বয়স্ক লোকও বেশি। কিন্তু এরূপভাবে নিমাতাসুলভ আচরণ বৈষম্য সৃষ্টি করলে আমাদের সমাজের ন্যায্য পাওনাদারগণ বঞ্চিত হতে থাকল। এরূপভাবে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করলেও জনমনে তার বিন্দুমাত্র আঁচড় করতে পারল না। এদিকে পূর্বযুগ হতে আমাদের মসজিদে বহির্সমাজের বিভিন্ন জামাত হতে লোকজন নিয়মিত নামাজ পড়তে আসত। সে সমস্ত জামাতেও ঘুরে ঘুরে আমাদের মসজিদে না আসার জন্য অনুরোধ করত। এমনকি উত্তর সিঙ্গেরগাড়ী তেলমনটারিবাসীগণ যদিও আমাদের সমাজের নয় তবুও পীরবাড়ির মসজিদ হিসাবে এখানেই জুম্মার নামাজ আদায় করত। নিয়মিত মুসল্লিদেরকে আমাদের মসজিদে নামাজ পড়তে নিষেধ করলেও যখন তারা নিয়মিত নামাজ পড়তে থাকল তখন ওনারা তাদের পাড়ায় গিয়ে এরূপ প্রস্তাব দিল যে, তোমরা তোমাদের পাড়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করলে নির্মাণের জন্য তোমাদিগকে অর্থ সহযোগিতা করব। কিন্তু জনতা এরূপ উত্তর করে দিল যে, "হুজুর আপনারা নির্মাণ কাজে বৃহৎ সহযোগিতা করিলেও আজীবন পরিচালনার জন্য প্রচুর খরচ লাগিবে। কিন্তু আপনারা গাছে উঠাইয়া দিয়া পলাইয়া গেলে আমাদের উপায় হবে কী? আমরা দরিদ্র মধ্যবিত্ত, আমরা এতবড় ঝুঁকি সামলাইতে পারিব না।" ফলে কাজটি দীর্ঘমেয়াদী হবে না। এরূপভাবে অদ্যাবধি বিভিন্ন অপকৌশল ও অপবাদ দিতেছে। ২৫-২-২০০৫ইং বাদ মাগরিব যখন মসজিদ হতে নামাজ পড়ে বের হচ্ছিলাম তখন জনৈকা মহিলা মসজিদের দরজায় দৌড়ে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলছিল, 'আব্বা এখনও পালান নাই'। তখন আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? তখন সে বলতেছিল, 'মাজারে নাকি বোমা বাহির হইয়াছে। আর ঐ বোমাটি জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞা পকেটে লইয়া সাইকেলে চড়িয়া গ্রামবাসীকে দেখাইতেছে।' সে আরও জানায় যে, আমি নাকি মসজিদ ও মাজার ধ্বংস করার জন্য বোমাটি পেতে রেখেছিলাম।

এতদশ্রবণে যদিও বিষয়টি হাস্যকর, তথাপিও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে লাগলাম। পরদিন সকালে শুনলাম, বোমাটি নাকি চেয়ারম্যানের কাছে জমা রেখেছে। যা শুনলে পাগলেও হাসবে। গ্রামের সাধারণ লোকেরা এটি শুনে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ সকলে জানে সাপ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জিনিস নয় এটি। ইহা শুধু বোমা বিষয়ক অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর সম্ভব। বিষয়টি আমাদের ঘাড়ে চাপাতে না পেরে পরে প্রচার করল ইহা একটি বল সাবান। কারণ সমাজের আপামর জনসাধারণের কাছে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বিষয়টি বুঝে দিতে না পেরে ভাষণ পরিবর্তন করল। হায়রে আফসোস! নিজের কায়েমী স্বার্থ বহাল রাখতে গিয়ে কি-না করল তারা।

এমনকি আমাদের এই নতুন মসজিদে নামাজ পড়া যায়েজ হবে না বলে প্রচার করত। অথচ আমাদেরই মুসল্লিদেরকে এরূপভাবে প্ররোচিত করছিল, "তোমরা নতুন মসজিদে না গেলে যদি পাড়ার মধ্যে আর একটি নতুন মসজিদ চালু কর তা নির্মাণ করতে যত টাকা লাগে আমরা ব্যয় করব।" কিন্তু ষ্টীলের গায়ে জোঁক ধরিল না। বিভিন্নভাবে অদ্যাবধি বিষয়টি বারংবার জনতাকে প্ররোচিত করতে থাকলে কোনমতেই জনতাকে বশে আনতে না পেরে বিভিন্ন নতুন ফন্দি আঁটছে। এমনকি পাগলের মত নতুন নতুন কথা বলে নিজের কাছে নিজেই আত্ম জিজ্ঞাসায় মর্মাহত হচ্ছে। গত ০১-০২-০৬ইং তারিখে আমি আমার ভক্তগণকে নিয়ে মাজারের পুরাতন গিলাপ পরিবর্তন করে নতুন গিলাপ মাজারে চড়াতে গেলে দেখি মাজারের দরজা তালাবন্ধ। তখন আমার বাড়ির বাৎসরিক ওরস মাহফিল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক সহযোগিতা নিয়েছিলাম। প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নিয়ে বারংবার চাবি চাইতে গিয়ে শূন্য হাতে ফেরৎ এসেছি। আমার সঙ্গে তখন বাবুর্চি, কসাই, স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ, গ্রাম্য নিরাপত্তাকর্মী, গ্রামবাসীসহ প্রায় ৩৫০ জন লোক ছিল। সকলে উত্তেজিত হয়ে জোরপূর্বক তালা ভেঙ্গে প্রতি বৎসরের ন্যায় মাজারের কাজটি সম্পাদন করবে। তখন আমি ভাবলাম হয়তো একটি খুন খারাবি হয়ে যাবে। দায়-দায়িত্ব চাপবে আমার উপর। বিভিন্ন ভেবে আমার জনগণকে ক্ষান্ত হতে অনুরোধ করলাম ও নীরবে জহুর বাবাকে বলে আসলাম, বাবা, তোমার পবিত্র স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ ঘর নির্মাণ করে কি এটাই আমার পাওনা ছিল।

এই ঘটনা OC সাহেব শোনার পর তিনি বললেন, পরবর্তী অনুষ্ঠান আসলে আমার হস্তক্ষেপে ইহা সংশোধন করে দিব। পরবর্তী অনুষ্ঠানে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে OC সাহেব মাজারের গিলাপ চড়ানোর বিষয়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সালাম সাহেব (বেলু) বলেন, মাজারে গিলাপ চড়ানো যায়েজ নহে। OC সাহেব ধর্মপ্রাণ মুসলমান কাজেই সেখানে কোন অধর্মের কাজ করতে দেওয়া যাবে না শুনে ফেরৎ এসেছেন। হায় আফসোস! মাজারের দানবাক্সের টাকা খাওয়া যায়। নিজ পিতা জান্নাতবাসী আলহাজ্ব শাহ তোজাম্মেল হোসেন সাহেবের মাজারে এখনও গিলাপ রয়েছে। এখন বুঝে আসে না এটা কোন বিদয়াত আর ওটা কোন শিরক। তারা এরূপ আচরণ পূর্ব হতে করছিল। যখন জহুর বাবার সমাধিস্থল মসজিদসহ নগ্নতায় ভরপুর ছিল তখন সে (আঃ ছালাম) নিজ পিতার সমাধিস্থলে অট্টালিকা নির্মাণ করে ঘুমাচ্ছিল। ইহাইতো গ্রামবাসীর প্রথম ক্ষোভের কারণ।

ইনশাআল্লাহ এর পরে মাজার সমাচার আত্মপ্রকাশ করলে মাজারের সম্মান, শ্রদ্ধা ও জিয়ারত অবাধে সর্বজনীনভাবে বৈধ আছে কি না তা উপযুক্ত দলিলাদি পেশ করে জবাব দেব বলে নিয়্যত করেছি।

এখন অন্য কথায় আসা যাক। শুরুতে ওনাদের সমাজে ১০-১২টি পরিবার ছিল। তারপর বিভিন্ন অপকৌশলে লোক বৃদ্ধি শুরু করলেন।

উনাদের মসজিদে গেলে যাবতীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংগঠিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। এমনকি আমাদের ইমাম সাহেবকে প্রাণের হুমকি দিয়েছে। তখন ইমাম সাহেবের "মা" এসে অনুরোধ করে "বাবা আপনারা আমার ছেলেকে ছেড়ে দেন নইলে আমার ছেলেকে ওরা আস্ত রাখবে না।" ইমাম সাহেব প্রাণের ভয়ে ঈমামতি করবেন না মর্মে চিঠি দিয়েছেন।

ছাদ ঢালাই, সিঁড়ি নির্মাণ ৬টি পিলার ভেঙ্গে নতুন করে ঢালাই করা ও মহিলাদের জিয়ারতের জায়গায় কক্ষ নির্মাণ ও মেঝেতে বালু ফেলান ইত্যাদি মিলে মোট সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ মাত্র।

দুঃখের বিষয়, প্রথম বার বিল্ডিং গাঁথুনীর সময় দেওয়ালে পানি কিউরিংয়ের জন্য সকলের বালতি নিয়ে পানি দিচ্ছিলাম। মোহাম্মদ আব্দুছ ছালাম বেলু সাহেব একথা জানতে পেরে তার চাকরকে ধমক দিয়ে বালতির পানি ফেলে দিয়ে বালতি নিয়ে যেতে বলেন।

দ্বিতীয় বারে ছাদ ঢালাইয়ের পর ছাদ কিউরিং করার জন্য নিয়মিত পঁচিশ দিন ব্যাপি ছাদে যে পানি দেয়া হয়েছিল তা কিউরিং শেষে প্রকৌশলী সাহেব পানিগুলো ছাদ হতে ফেলতে বললেন। আমরা পানি আটকানো আইলগুলো কেটে দিয়ে চতুর্দিকে পানি ফেলতেছিলাম। তখন বেলুর নির্দেশে বদরুল আলমের দ্বারায় তাঁদের জায়গায় পানি ফেলতে বাধা প্রদান করেন। উপায়ন্তর না পেয়ে পানিগুলো বিকল্প পথে ড্রেন করে অন্যত্র সরাতে বাধ্য হয়েছিলাম। উল্লেখ্য, গাছ কাটাতেও বদরুল আলম ও ডাঃ আব্দুর রশীদ-এর দ্বারায় বাধার সৃষ্টি করেন।

হায় আফসোস! যাহাদের এহেন আচরণ তেনারা আওলাদে অলী দাবীদার হয়েছেন মহান অলীর গৃহনির্মাণে যত প্রকার বাধাবিপত্তি ও ষড়যন্ত্র করা সম্ভব ছিল তার কোনটিরও ত্রুটি করেন নাই।

এমনকি এমপি সাহেবের দেয় বিশ হাজার টাকা উত্তোলন করে 'কোন খরচ করা হয় নাই' মর্মে দুর্নীতি দমন অফিস নীলফামারীতে অভিযোগ করা হয়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভাউচারাদি সহ যাবতীয় খরচের হিসাব চেয়ে নোটিশ প্রেরণ করা হয়।

যথাসময়ে টি.এন.ও অফিস ও ডিসি অফিসে অতীতের পেশকৃত ভাউচার উত্তোলন করে দুর্নীতি দমন দপ্তরে পেশ করে হাজিরা দিয়েছিলাম।

এখন কথা হলো, মহান অলীর প্রতিষ্ঠান মসজিদ ও পবিত্র স্মৃতিসৌধ নগ্নতা থেকে স্বশ্রদ্ধাসহকারে ইমারত নির্মাণ করে আজ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। এটাই হলো আমার এ মহৎ কাজের ফলাফল।

তবে হ্যাঁ আগুনে আঘাত হানলে আগুন বৃদ্ধি পায়। আশ্চর্য হলেও সত্য, দুর্নীতি দমন অফিসে এ সমস্ত কাগজ দেখানোর জন্য ডিসি অফিসে যখন নথিপত্র সংগ্রহ করছিলাম অফিসারগণ বিস্তারিত বিবরণ শুনে মসজিদ নির্মাণের জন্য নগদ এক হাজার টাকা অর্থ সহায়তা করেন।

এদিকে প্রবল প্রতিবাদ বাদবিষংবাদ উপেক্ষা করে কেবলাজানের স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করে জনগণের হাতে ছেড়ে দিব, আগে থেকেই ভাবতেছিলাম এবং ঘোষণা দিয়েছিলাম পূর্ব হতেই। কথা ছিল, তিনতলা মসজিদ তৈরি করে সুন্দর ডেকোরেশন করে একটা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দর্শনীয় স্থান তৈরি করব। কিন্তু যেখানে অহরহ খুন-খারাবী, রক্তপাত ও মানহানীর সম্ভাবনা ছিল, তা বুঝতে পেরে দুই গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় এক হাজার গুণীজনকে ঈদুল ফিতরের দিনে বিকালে ডেকে বিস্তারিত বিষয়টি অবহিত করলাম। কারণ ছিল যদি কিছু একটা ঘটে যায় তাহলে তো গ্রামের জনসাধারণকে পূর্বে তার আভাস দেওয়া প্রয়োজন। আমি আমার নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ আরম্ভ করলাম। তখন গ্রামের জনসাধারণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সকলে কাজে সহযোগিতা করলেন। কাজ চলাকালীন মাইকে হামদ ও নাতে রাসুল (সাঃ) বলা হচ্ছিল। ,পবিত্র মাজার শরীফে বৃষ্টির মত ফুল অর্পণসহ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছিল। কাজটির স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ভি.ডি.ও ফিল্ম করা হয়। বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে মিলাদ শরীফসহ উদ্বোধনের জন্য ডাকা হয়েছিল। কিন্তু উনারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা সাহেব, মোঃ আব্দুছ ছালাম বেলু সাহেব, মোঃ আবু রায়হান, ডাঃ মোঃ আব্দর রশীদ, আহম্মদ হোসেন ও রফিকুল ইসলাম বসুনিয়া সকলেই বাড়িতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বারংবার ডাকার পরও মসজিদ প্রাঙ্গণে আসার জন্য অনুরোধ করলে কেহই আসেন নাই। কি যেন অজানা ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন।

যাবতীয় পরিস্থিতি চিন্তা করে দেখে শুনে বাধ্য হলাম নতুন মসজিদ তৈরি করতে। বিশেষ করে মোহাম্মদ আব্দুছ ছালাম বেলু সাহেব বিভিন্ন কটুক্তি করেছিলেন। তারই নেতৃত্বে এতসব ঘটেছে যদিও অন্যান্যদের দ্বারায় প্রকাশ পেয়েছে।

মূল কথা ছালাম সাহেবেরা নিজ নিজ মুরিদ এলাকায় Collection কৃত টাকা মসজিদের কাজে না লাগানোর বিষয়টা উনাদের ভক্তরা প্রত্যক্ষ করে দেখে শুনে জবাবদিহিমূলক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিধায় ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক আচরণ প্রকাশ পায়। তখন আমরা দ্বিতীয় শুক্রবার তাম্বু লটকিয়ে জুমআর নামাজ আদায় করি।

আশ্চর্যের বিষয় নামাজান্তে ঘরে ফিরছিলাম। হঠাৎ করে আমার মাথার উপর একটা মৌচাক ঘুরতেছিল। আমি যেখানেই সরে যাই চাকটিও সেখানে যাচ্ছিল। তখন আমি মাছিদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমরা যদি আমার জন্য প্রেরিত হয়ে থাক তাহলে আমার বাড়ির গেটের আমগাছটিতে চাক লেগে যাও। তখন মাছিগুলো শান্ত হয়ে আমগাছে আশ্রয় নিল।

উপস্থিত জনতামন্ডলী আশ্চর্য হয়ে বিষয়টি অনুধাবন করতে লাগলেন। সেই থেকে আজ অবধি সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া শরীফ বাইতুন নূর শাহী মসজিদ পূর্ণাঙ্গরূপে চলে আসছে। কিন্তু শত চেষ্টা লোভ, প্রলোভন, ভয়-ভীতি যত কৌশল ছিল সব প্রয়োগ করেও এ অবধি জনগণকে ফেরাতে পারেন নি। এমনকি কাউকে কাউকে 'কার্ড দিব, বয়স্কভাতা দিব, লুঙ্গি দিব, শাড়ি দিব' ইত্যাদি বলে লোভ দেখিয়ে মিথ্যা স্বপ্ন প্রচার করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু দারুণ অভাবের মধ্যে থেকেও তাদেরকে বিপথগামী করতে পারেন নি।

উল্লেখ্য যে, আমাদের নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানা জেলার সবচেয়ে অবহেলিত অঞ্চল। অপরদিকে মঙ্গা কবলিত অঞ্চল হিসাবে এ এলাকা সবাই জানে। সেই দরিদ্র অঞ্চলে টাকার লোভ দেখিয়ে, গরু কিনে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে, ভ্যান কিনে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ও চাকরির প্রলোভন দিয়ে কোন লাভবান হতে পারেন নি। আমাদের সমাজের লোকজন যে দৃঢ়, মজবুত ইমানের অধিকারী তা এক্ষেত্রে সকলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাদেরও সৌভাগ্য যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

মিথ্যা স্বপ্ন প্রচারে চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ মোঃ আঃ ছালাম বেলু সাহেব ও মোঃ আবু রায়হান সাহেব এবং কয়েকটি ঘটনাঃ

১। একদিন মোঃ আঃ ছালাম বেলু সাহেব আমাদের নিয়মিত মুসল্লি মোঃ নেপসা মিঞাকে তার বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করেন যে, 'বাবা আপনাকে একটি মিথ্যা স্বপ্ন প্রচার করতে হবে, তাহলে আপনাকে বয়স্ক ভাতার কার্ড দেওয়া হবে।' তিনি বললেন, কী স্বপ্ন? তখন আব্দুছ ছালাম বেলু সাহেব বললেন, 'তুমি তোমাদের নতুন মসজিদে গিয়ে বর্ণনা করবে যে, জহুর বাবা আজ রাতে স্বপ্নে

আমাকে নতুন মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। তাই আমি আর নতুন মসজিদে যাবো না।'

একথা শুনে মোছাম্মৎ ফেলনা মিঞা বলেন, 'জুমআর নামাজে আমি সাহেব নামাজজনক কাজ করতে পারব না'।

মোঃ আঃ জলিল সাহেব মনে করছিলেন, দারিদ্রতার মধ্যে মানুষ ইমাম নিয়ে করতে পারে। কিন্তু তার কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলো না।

৬। এদিকে আমাদের ইমাম সাহেবকে মোঃ আবু রায়হান বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি তোমার মাথার উপর এক বিরাট কাল কাক এসে তোমার মগজ খাচ্ছে। তখন আমি বললাম, এ আমার ছেলে। এর ক্ষতি করিও না।

এই স্বপ্নের লক্তিতুরে ইমাম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বলেন, "যতদিন ঐ কাক পীরসাহাবার অসিলায় আমার পায়ে নত হয় নি ততদিন আমি ঐ কাককে ছাড়বো না"।

৩। এদিকে মোঃ আফতাবুজ্জামান সাহেব নিয়মিত স্বপ্ন দেখেন যে, নতুন মসজিদে নামাজ হবে না। জহুর বাবা নাকি তাকে স্বপ্নে দেখান। অথচ যখন ছাদ ঢালাইয়ের দিনে আফতাবুজ্জামান সাহেবকে ছাদ ঢালাই উদ্বোধনী মিলাদের জন্য ডেকেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন, 'অদ্য রাত্রে স্বপ্নে আমি আমার কেবলাজানকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, "শামসুল ছাড়া" ছাদ ঢালাই সহ পরবর্তী যাবতীয় কাজ কেহই করতে পারবে না। আর যেদিন আমরা মসজিদ হতে নিরবে চোখের জল ফেলে সরে দাঁড়ালাম সেদিনও আফতাবুজ্জামান সাহেব বলেছিলেন আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি জহুর বাবা আমাকে সকলকে বলতে বলেছেন ওকে (শামসুলকে) লাঠি পেটা করে মসজিদ হতে তাড়িয়ে দাও। তাই তেনারা কেবলাজানের আদেশ পাইয়া ঘুণাক্ষরেও রদ বদল করলেন না। হায়রে স্বপ্নের তেলেছমাতি। একথা শুনতে শুনতে অতিষ্ট হয়ে আমি নিজে জহুর বাবার মাজারের পাদদেশে গিয়ে বলি, "বাবা, যদি নতুন মসজিদে নামাজ না হয় তাহলে একসাথে ৮/১০ জনকে স্বপ্ন দেখান। তাহলে আমরা নতুন মসজিদে নামাজ না পড়ে আবার পুরাতন মসজিদে যাব।"

এদিকে গ্রামবাসী একটি মাইক ক্রয় করার জন্য সকলের কাছে চাঁদা গ্রহণ করে। এতে আমিও দু'শত পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলাম। পরে যখন মাউথ পিচটি হারিয়ে গেল তখন মাসাধিক কাল মাইকের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। যখন দেখলাম কারো মাথায় কোন চিন্তা নেই, তখন আমি ৫০০/- টাকায় একটি মাউথ পিচ কিনে দেই। আজও সেই মাইকে আমাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা পেশ করে।

উপসংহারে প্রবল প্রতিযোগিতা, প্রাণহানীর উপক্রম, রক্তপাতের সম্ভাবনা, অধিকারহীনতা (মুনাফিকি), মসজিদের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা না থাকা, জায়গার দাবিদার হয়ে দখল করা ইত্যাদি বিবিধ কারণ বিবেচনা করে আমরা আলাদাভাবে নতুন জায়গায় নতুন মসজিদ স্থাপন করে সমাজের সকল মুসল্লির সহযোগিতায় অদ্যাবধি নতুন মসজিদটিতে জোয়ারের ন্যায় নামাজী আগমনসহ যাবতীয় কার্যকলাপ চলে আসছে।

এমতাবস্থায় সুধী পাঠকমন্ডলী ও পূর্ব নির্মাণ কাজের সহযোগিতাকারী ও দেশের জ্ঞানীগুণী আলেমগণের ও সমাজের কাছে আমার আবেদন এই যে, আমার এবং আমাদের সমাজের মুসল্লিদের সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কি না? শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি না? সার্বিক বিবেচনায় উত্তর পাইলে চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

নিবেদক

খাকছার আলহাজ্ব শাহ্ মুহাঃ শামসুল আলম আজিজি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৭৮৬-৬৬-৯২

আরেফে মোকাম্মেল, কুতুবুল এরশাদ, হাদীয়ে জামান, হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শতাব্দী প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া শরীফ জামে মসজিদ আমাদের সকলেরই প্রিয় ও পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য হলেও বর্তমানে আমরা অনভিপ্রেত কিছু পরিস্থিতির কারণে অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও উক্ত মসজিদ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। নিতান্তই নিরূপায় হয়ে উক্ত মসজিদ ত্যাগের কিছু কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।

** অর্থ তসরূপ।

** নিরাপত্তাহীনতা।

** মসজিদের জায়গায় মালিকানা দাবি করা।

** মসজিদের ভিতরে ভাগ করে তালা দেওয়ার প্রচেষ্টা।

** মসজিদের রাস্তা না থাকা।

** সাধারণ মুছুল্লীদের বাক স্বাধীনতা বা কথা বলার সুযোগ না থাকা তথা অধিকারহীনতা।

** সংস্কার কাজে বিভিন্ন কৌশলে বাধা প্রদান।

** গাছকাটা প্রয়োজন হলেও গাছ কেটে দিতে অস্বীকার করা।

** মসজিদের দান বাক্সের তালা ভেঙ্গে কে বা কাহারা অর্থ চুরি করে।

** বিভিন্ন স্থানে মসজিদ মাজারের নামে টাকা তুলে জমা না দেয়া।

** প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষ কর্তৃক আমাকে, আমার পরিবারবর্গ সহ সাধারণ মুছুল্লীদের মসজিদে নামাজ আদায়, চলাফেরা, উঠাবসা সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতা।

** মসজিদে স্বাধীনভাবে ইবাদত বন্দেগী করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

** মুছুল্লীদের ইবাদতে ও যাতায়াতের নিরাপত্তাহীনতা।

** মসজিদের ছাদ ঢ়ালাইয়ের সময় বিভিন্ন অপকৌশলে নির্মাণ কাজে বাধা প্রদান।

আরও বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান থাকায় তাহা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ-

১। মসজিদ আল্লাহর ঘর। সকল শ্রেণীর মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান। স্থানীয় একটি মহল মসজিদের সম্পত্তি দাবি করায় তাদের মধ্য হতে এই ধারণা লোপ পেয়েছিল। যার বহিঃ প্রকাশ ঘটে নিম্নোক্ত কারণসমূহের মাধ্যমেঃ-

ক) তারা মসজিদের সমস্ত আয় দীর্ঘ প্রায় ৪০ বৎসর নিজস্ব সম্পদ মনে করে ব্যয় করত। কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ এই দীর্ঘ সময়ে প্রদান করেন নাই। মোট কথা, মসজিদের আয় যেন তাদের নিজ নিজ (কতক ব্যক্তির) ব্যক্তিগত তহবিলে পরিণত হয়েছিল। মসজিদের আয় যেন তাদেরই ব্যক্তিগত আয় ছিল।

খ) শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রঃ) এর আওলাদগণ ও সাধারণ মুসুল্লিরা বিভিন্ন সময় আয়-ব্যয়ের হিসাব চাইলেও তারা তা দেন নাই। বরং তাদের একজন, জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিয়া বলেছিলেন, "বাবাজি বড় ভাই ও বেলু সাহেবকে অনেক আয়ের উৎস দিয়াছেন। আর আমাকে গুল খাওয়ার পয়সা যোগানোর জন্য এই দান বাক্স দিয়েছেন।" তার এই উক্তির প্রতিবাদে, মসজিদের এক পার্শ্বে একটি সর্বদলীয় দান বাক্স তৈরি করা হয়। যা মুছুল্লিদের মধ্যে কৌতুহল ও সংশয়ের সৃষ্টি করে।

গ) মসজিদের উন্নয়ন ও পরিচালনার ব্যাপারে সাধারণ কোন মুসুল্লি বা তাদের (স্বার্থান্বেষী মহলের) বাইরে কেউ কোন মন্তব্য করলে বা কথা বলতে চাইলে তারা তাকে হেয়প্রতিপন্ন ও লাঞ্ছিত করতেন। তারা বলতেন, "এই জায়গা আমাদের পূর্ব পুরুষের। তারা (পূর্বপুরুষরা) দান করেছেন। আমরা আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করব। অন্য কারো কোন মন্তব্য চলবে না। তোমরা (মুসুল্লিরা) নামাজ পড়বে, চলে যাবে। এতে মন চাইলে আসবে, অন্যথায় আসবে না।"

ঘ) মসজিদ পুনঃ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিয়া, মসজিদের সংস্কার কাজের বালু ও সিমেন্ট তার বাড়ির কাজে ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে চাওয়া হলে, তিনি বিভিন্ন টালবাহানা ও কৌশল অবলম্বন করে মসজিদের বালু ও সিমেন্ট ফেরৎ প্রদান না করে কালক্ষেপণ করতে থাকেন। অদ্যাবধি, জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিয়া, মসজিদের বালু ও সিমেন্ট ফেরৎ প্রদান করেন নাই। এছাড়া তিনি মসজিদের সংস্কারের মোটা অংকের টাকা বিভিন্ন কৌশলে আত্মসাৎ করেন।

ঙ) মসজিদের নুতন ভবন নির্মাণের সময় তারা মসজিদে বারান্দা নির্মাণে বাধা প্রদান করেন এবং বারান্দার দরকার নেই বলে জানিয়ে দেন। এর কারণ হিসাবে তারা বলেন, মসজিদে বারান্দা নির্মাণ করা হলে, আমাদের বাড়ির রাস্তা বন্ধ হবে। মূলতঃ এটা ছিল মসজিদের

নির্মাণ কাজ বন্ধ করার একটা অপকৌশল। প্রকৃত অবস্থা হলো, মসজিদের বারান্দা মসজিদের জমিতে হবে এবং এর পরেও এত জায়গা খালি থাকবে যে, তারা অবাধে চলাফেরা করতে পারবেন। পরবর্তীতে তাদের বাধার মুখে মসজিদের বারান্দা ছোট করে নির্মাণ করা হয়। এখনও তাদের যাতায়াতের জন্য প্রচুর জায়গা খালি আছে।

২। আমার দায়িত্বকালীন সময়ে মসজিদের দান বাক্সের ৭০টি তালা ভেঙ্গে টাকা পয়সা চুরি করে নেয়। কিন্তু তার কোন বিচার পাওয়া যায় নাই। অথচ এখন তাদের দায়িত্বে দানবাক্স পরিচালিত হওয়াকালীন সময়ে তালা ভেঙ্গে আর চুরি হচ্ছে না।

৩। পূর্ব থেকেই তাদের খারাপ আচরণের কারণে মসজিদে, ইমাম মুয়াজ্জিন থাকতে চাইত না। ফলে অনেকদিন নিয়মিত আযান হতো না।

৪। মসজিদ পুনঃ নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শেষে সাময়িক সব কাজ বন্ধ থাকে। উল্লেখ্য, সে সময় কিছু সরকারী সাহায্য এসেছিল। আমি সভাপতি হিসাবে মসজিদের দায়িত্ব নেই ১৯৯৬ সনের দিকে। সেই টাকা যার পরিমাণ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ও আমার প্রায় ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ব্যয়ে দেয়াল পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়। কাজ বন্ধ হলে তারা দুর্নীতি দমন অফিসে আমার বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ দেয়। আমি মসজিদের তখনকার সংস্কার কাজের সব আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে দুর্নীতি দমন অফিসে হাজির হই। দুর্নীতি দমন অফিসের কর্মকর্তারা হিসাব-নিকাশ দেখে আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন এবং ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মসজিদের জন্য প্রদান করেন।

৫। মসজিদের ছাদের কাজ শুরু হলে অনেকেই পীরজাদাগণের কাছে উন্নয়নের জন্য টাকা পয়সা দেন। কিন্তু তারা ঐ সমস্ত টাকা জমা দেন নাই। পীরজাদা বেলু সাহেব, পীরজাদা রাজা সাহেব সহ অনেকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে। এই প্রেক্ষিতে দানের টাকা যাতে মসজিদের কাজে সঠিকভাবে ব্যবহার হয় এ লক্ষ্যে একটি সাইনবোর্ড লাগাই। ঐ সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, "যে যাহা দিবেন নিজ হস্তে দান বাক্সের মধ্যে ফেলুন"। নিবেদক শাহ্ মুহাঃ শামসুল আলম আজিজি। এভাবে সাইন বোর্ডটি প্রায় ৫ (পাঁচ) মাস ছিল। কিন্তু ঐ পাঁচ মাসের মধ্যে তারা কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই। কাজেই ছাদ নির্মাণের কাজ যথারীতি চলছিল। পরে ছাদ নির্মাণ হলেও অন্য কাজ বাকি ছিল। তবুও আমরা অস্থায়ী মসজিদ থেকে মূল ভবনে নামাজ পড়তে চাইলে, পীরজাদা বেলু সাহেব

ফতোয়া দেন যে, এই সাইন বোর্ড থাকলে মসজিদে নামাজ হবে না। এক পর্যায়ে তিনি কিছু সন্ত্রাসী ও সহযোগীসহ গালিগালাজ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমার স্থাপিত ঐ সাইনবোর্ডটি জোর করে তুলে ফেলেন।

৬। এ পর্যায়ে তারা দাবি করেন, এই জমিতে মসজিদ থাকলেও জায়গাটি আমাদের বাপ-দাদা ওয়াকফ্ করেন নাই। জায়গার কাগজপত্র আমাদের নামে আছে। মূলতঃ জায়গাটি লিখিত ছিল না। তাদের পক্ষের উক্ত জমির কাগজপত্র হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাটে লোকজনকে দেখাচ্ছিল জনমত তৈরি করার জন্য। জমির প্রকৃত অধিকারী হিসাবে বাংলাদেশের আইনে তাদেরই মালিকানা সঠিক। এ পর্যায়ে সাধারণ মানুষ তাদেরকে জমিটি মসজিদের নামে লিখিতভাবে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেও তারা ঐ জমি মসজিদের নামে লিখে দিতে সাফ অস্বীকার করে। উল্লেখ্য, উক্ত জমিতে শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর আওলাদ হিসাবে আমারও অংশ আছে। আমিও সকলকে অনুরোধ করি চলুন, আমরা জমিটি মসজিদের নামে লিখিতভাবে দিয়ে দেই। কিন্তু আমার অনুরোধেও তারা জমিটিতে থাকা তাদের দাবিকৃত অংশ মসজিদের নামে লিখিত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এই সম্পত্তি মসজিদের নামে লিখিত দেয়ার প্রস্তাব করার কারণে বেলু সাহেব গং পরিকল্পিতভাবে ভয়াবহ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরিস্থিতিটা এতই ভয়াবহ ছিল যে, সেখানে যে কোন মুহূর্তে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

তারা এমতাবস্থায় আমাকে বললেন, তোমার .০২ (দুই) শতক জমি তুমি বের করে নাও এবং ঐ জায়গায় নামাজ পড় তোমার লোকজন নিয়ে। তারা আর একটি শর্ত দেন যে, যদি তুমি মসজিদের অংশে ভাগ নেও তবে মাজারের ভিতর থেকে তোমার দাদাসহ অন্যদের কবর তুলে নিয়ে যাও। এমতাবস্থায় আমি পূর্ব পুরুষদের ইজ্জত রক্ষার্থে মাজার অংশ গ্রহণ করি। তবে মসজিদ থেকে চলে আসার পর আমরা নুতন মসজিদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় নামাজ না পড়ে পার্শ্বের একটি জায়গায় কিছুদিন নামাজ আদায় করি। প্রতিপক্ষের সহিত সমঝোতার আশায় অপেক্ষা করতে থাকি। এভাবে ১৫ দিন অপেক্ষা করার পর বুঝতে পারি তারা সমঝোতা চান না। কারণ তারা ঐ সময় নুতন করে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র শুরু করে আমার বিরুদ্ধে এবং সাধারণ মুছল্লীদের বিরুদ্ধে। তাই বাধ্য হয়ে ১৫ দিন অপেক্ষা করার পর নুতন মসজিদের জন্য এলাকার মুছল্লী ও সাধারণ মানুষের পছন্দ করা আমার জায়গা নুতন মসজিদের জন্য ওয়াকফ্ করে

দেই এবং ওয়াক্‌ফ করে দেয়া নুতন মসজিদের নির্দিষ্ট স্থানে নামাজ আদায় শুরু করি।

৭। ছাদ ঢালাইয়ের কিছুদিন পূর্ব থেকে বেলু সাহেব গং বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকেন। বেলু সাহেব প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে থাকেন, মসজিদের ছাদ ঢালাই করতে দেব না। এমন চাল চেলেছি যে, কখনও মাজার ও মসজিদের ছাদ হবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি বাজে কথা ও বিভিন্ন প্রকার হুমকি প্রদর্শন করে প্রতিনিয়ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন, যেন এই বোধ হয় মারামারি লাগল। আমি কৌশলে গন্ডগোল এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু সর্বদা ভয়াবহ কোন দুর্ঘটনা ঘটার মত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আমার, আমার পরিবারবর্গ ও সাধারণ মুছুল্লিদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

৮। ছাদ ঢালাইযের পর প্রতিপক্ষের সহযোগিতায় কিছু দুষ্টলোক রাত্রে মসজিদের সাটারিং এর কিছু বাঁশ চুরি করে। যাহা মসজিদের ছাদের জন্য হুমকি ছিল। আমি পরে আব্দুল বারীক নামক একজনকে ২০০/- টাকা দিয়ে পাহারাদার নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

৯। এক পর্যায়ে বেলু সাহেব গং মুছুল্লিদের সাথে তাদের খারাপ আচরণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে প্রতিমুহূর্তে মারাত্মক কোন দুর্ঘটনার আশংকায় চিন্তিত থাকতে হয়। কোন দুর্ঘটনা ঘটার মত পরিবেশ যেন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যা আমাকে শংকিত করে তোলে।

১০। এমন পরিস্থিতিতে তারা বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিত। যেমন তাদের পক্ষের বদরুল আলম একদিন গোপনে আমাকে জানায় যে, আপনি কখনও একা ঐ মসজিদে যাবেন না। কারণ তারা সিদ্ধান্ত নিয়াছে আপনাকে একা পেলে আপনার ক্ষতি করবে।

১১। এছাড়া আমার বড় বোন, আনোয়ারা বুবুকে বেলু মিয়া ডেকে বলেছিল, তোর ভাইকে সাবধানে থাকতে বলিস। আমি ওর রক্ত দিয়ে গোসল করব।

১২। এ পর্যায়ে আমরা পুরাতন মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া ছেড়ে দেই। কিন্তু এক শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়তে যাই। যাওয়ার সময় সাধারণ মুসুল্লিদের অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার মধ্যে দেখতে পাই। তারা সাধারণ মুসুল্লিদেরকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করে বলে যে, মসজিদের কোন রাস্তা নাই। বেটারা কার জায়গা দিয়ে মসজিদে যাও। এ সময় তারা আরও হুমকি দিতে থাকে। তখন মুসুল্লিরা অন্য রাস্তা দিয়ে মসজিদে

গেলেও তাদের (মুসল্লিদের) মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করে। একেতো মসজিদের জায়গার অস্তিত্ব নিয়ে সমস্যা, তার উপর নিরাপত্তা সমস্যা। আমি নিরাপত্তা নিয়ে বেশি শঙ্কিত হই।

১৩। তবুও আমরা জুম্মার নামাজ আদায় করে বের হয়ে আসার পর জানতে পারি, তারা লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত ছিল। কোন প্রকার উচ্চবাচ্য হলেই Action নিবে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমরা সে যাত্রা বেঁচে যাই। কিন্তু আমাদের শঙ্কা আরও বৃদ্ধি পায়।

১৪। এ পর্যায়ে আমরা মসজিদে যাওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করি। এমন সময় আমাদের ইউ,পি চেয়ারম্যান এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিলে আমরা চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দেই, আপনি যা সিদ্ধান্ত নিবেন, আমরা তা মেনে নিব, আমাদের এই সিদ্ধান্তে তারা প্রমোদ গুণতে থাকে যে, সমস্যাটি এ্যাত সহজে সমাধান হয়ে যাবে? তখন তাদের পক্ষের সিটু মিয়া এক মুরুব্বীকে ধাক্কা মারে এবং ভীষণ মারামারি সৃষ্টি হয়। রাতের অন্ধকারে সেই ভীষণ মারামারিতে মারাত্মক কিছু ঘটনার আশংকায় আমি ভয়ে ভীত হই। আমার লোকদের দ্রুত সরিয়ে নেই। পরে জানতে পারি যে, তারা মিটিং করে মারামারির পূর্ব প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত নিয়েই তৈরি ছিল।

১৫। আমরা পরদিন চেয়ারম্যানের কাছে গেলে তিনি বলেন, আমি পরে দেখব এবং ঐদিনই বিকালে তিনি আঃ কাদের মেম্বার মারফৎ জানিয়ে দেন যে, তিনি (চেয়ারম্যান) কিছু করতে পারবেন না।

১৬। এ পর্যায়ে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুতর হয়ে ওঠে। আমরা তখন ভাবতে লাগলাম, ইবাদত শান্তির জন্য। তার বিপরীতে আসে বিশৃঙ্খলা। এহেন পরিস্তিতিতে আমরা তাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য একটি নুতন মসজিদ নির্মাণ করি। আমাদের পুরাতন জামায়াতের প্রায় ৯৫% লোক নুতন মসজিদের জামায়াতে শামিল হয়ে নামাজ আদায় করছি। পুরাতন মসজিদ ভবনটি বর্তমানে যে স্থানে অবস্থিত তাহাও অতীতে সামান্য দূরে অবস্থিত ছিল। যাহা বাড়ি ঘরের সুবিধার্থে একটু দূরে স্থানান্ত র করা হয়। পুরাতন জায়গাটি অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। বর্তমান পুরাতন মসজিদ হইতে নুতন মসজিদটি তুলনায় বেশ দূরে "জহুরিয়া শরীফ বায়তুন নূর শাহী মসজিদ" নামে চালু করা হয়। ইহার বয়স দুই বৎসরের অধিক।

১৭। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, মসজিদ পৃথক হওয়ার আরও একটি কারণ রহিয়াছে। ওনারা ওনাদের অংশ .০৮ (আট) শতকের মধ্যে .০৭ (সাত) শতক

মাপিয়া লইয়া আমাদের মাত্র .০১ (এক) শতক বাহির করিয়া দিয়া মাননীয়রা দিয়া নিজ অংশে তালা লাগিয়ে দিতে মত প্রকাশ করেন।

১৮। পুরাতন মসজিদের চতুর্দিকে কয়েকটা গাছ ছিল। ইমরাত প্রকৌশলীদের মতে গাছগুলো মসজিদের ভবনের জন্য হুমকি স্বরূপ বলে মত প্রকাশ করেন। যার দরুন ইমারত প্রকৌশলীদের পরামর্শে গাছসমূহ কেটে দেয়ার জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তারা গাছ কেটে দিতে অস্বীকার করে এবং এ নিয়ে অনেক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

এতদসমূহ চিন্তা করিয়া সম্পূর্ণ অংশ ছাড়িয়া দিয়া নুতন মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেই। তবে আমরা আপোষ নিষ্পত্তির আশায় নুতন মসজিদের জমি ওয়াক্‌ফ বেশ বিলম্বে করি। কিন্তু কোনমতেই তাহাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে না পেরে সকল মুসুল্লিদের অনুরোধে সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ও স্বাধীনচিত্তে এবাদতসমূহ আদায় করার নিমিত্তে, 'জহুরিয়া শরীফ বাইতুন নূর শাহী মসজিদ'টি চালু করি।

এমতাবস্থায় শুধু ওলামা সমাজের কাছে আবেদন এই যে, এই নুতন মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করা আদৌ ধর্মীয় বিধান সঙ্গত হবে কি না- এই মর্মে ফতোয়া দিয়ে বাধিত করবেন।

বিস্তারিত জানবার জন্য "মসজিদ সমাচার" এর পান্ডুলিপির ফটোকপি দেয়া হলো।

নিবেদক

শাহ্ মোঃ শামসুল আলম আজিজি

গ্রাম ও ডাক- সিংগরগাড়ী,

থানা-কিশোরগঞ্জ, জেলা- নীলফামারী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবার

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুফতি আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল

কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদরাসা

জয়েন্ট কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭।

মোবাইল ঃ ০১৮৭-৫৩৬৩৬৩

সূত্র ঃ .....

তারিখঃ ২৩/৮/০৩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد!

প্রকাশ থাকে যে, আবেদনকারী জনাব শাহ মোঃ শামছুল আলম সাজিজি, গ্রাম ও ডাক-সিন্ধের গাড়ী, থানা-কিশোরগঞ্জ জেলা-নীলফামারী-এর বিদজ পাঁচ (০৫) পৃষ্ঠা সম্বলিত লিখিত বিবরন সত্য হলে আবেদনে উল্লেখিত নতুন মসজিদে জুমা সহ যাবতীয় নামায জামাত সহকারে আদায় করা ইসলামি শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে। كما في الدر المختار وللاهل المحلة جعل المسجد واحدا اوعكسه وفي الاشباه والنظائر لاهل المسجد جعل المسجد الواحد مسجدين والاول لكل طائفة مؤذن كذا في الفتاوى الرضوية هذا ما ظهر لي من الجواب والله تعالى اعلم بالصواب

فقط

كتبه احقر الورى

২৩/৮/০৩

আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক
উপাধ্যক্ষ
কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মাজগ্রাম এম, এ মিনিয়ার (ফাজিল) মাদ্‌রাসা

স্থাপিত ঃ ১৯৮১ ইং

ডাকঘরঃ চান্দুইর খীরনাড়া, উপজেলাঃ নন্দীগ্রাম, জেলাঃ বগুড়া।

بالله الرحمن الرحيم

جناب شمس العالم صاحب (پہلی بیان) کی مطابق اگر اپنا حصہ انتالیم ہو جدا
مقتدی سمتا نہیں اور دوسرا طرف بڑھانیکا کوئی جگہ نہیں ہو - اور دوسرا
کا حصہ وقف شدہ نہ ہو اور وہ جگہ جگہ کا داوی بھی کرتا ہے مسجد میں جانیکا
جاز کا خوف بھی ہے ایسا حالت میں محلہ کی سب باشندہ ملکر دوسرا مسجد بنانا
① جائز ہے - (کذا فی السراجیہ والعالمگیریۃ) قال فی المنیۃ اھل المسجد لو بنوا
غلۃ المسجد او نقض المسجد باذن القاضی ای جماعۃ المسلمین صح ای جاز -
اس سے معلوم ہوتا ہے مذکورہ نقصان اور خوف سے دوسرا مسجد بنانا جائز ہے ؟

② قال فی الشامی (تحت قولہ صلوۃ الجمعۃ فی مصر واحد بمواضع کثیرۃ) مطلقاً علی المذھب -
وعلیہ القتولی - قولہ علی المذھب - خصہ ذکر الامام السرخسی ان الصحیح من مذھب
ابی حنیفہ جواز اقامتھا فی واحد فی مسجدین او اکثر -
شامی کی مذکورہ عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے نئی مسجد بنانا جیسے جائز ہے ایسا ہی
ایسا ہی اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے -
واللہ اعلم بالصواب -

احقر الوری حضرت مولانا ابراھیم صاحب -
ماجگرام فاضل دار
بگورہ -

এখন প্রশ্ন হলো, আমি প্রশ্ন রেখেছি বিজ্ঞ-উলামা বিশেষ করে আমাদের এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান জ্ঞানী, শিক্ষিত মহলের কাছে যদি উপরোক্ত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আমিসহ আমার সমাজ যে নতুন মসজিদে নামাজ পড়তেছি তা আদৌ শরীয়ত সম্মত হচ্ছে কি না? যেহেতু এটা পার্থিব কোন ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে ছিল না। ইহাতে বলপ্রয়োগ করে কাউকে অধীনস্থ করা আমার অধিকার নাই, ভিলেজ পলিটিক্সের ইলেকশনের আশাধারী নই। আমার মধ্যে লোভ দেখানো, ভয় দেখানোর কোন আলামত বিদ্যমান ছিল না। আমার এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই, যাতে কাউকে চাকুরি দিব প্রতিশ্রুতিতে বাধ্য করিয়ে আবার আমার অধীনস্থ করব। তবে প্রসঙ্গগত একটি কথা বলে রাখা জরুরি মনে করছি। বিগত কয়েক বৎসর আগে আমি একটা মাদ্রাসা তৈরি করে আমার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে এলেম ছড়ানোর পরিকল্পনা করি। এ কারণে মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় জমিজমাসহ ক্ষীণ আকারে হলেও ঘরবাড়ি নির্মাণ করে মাদ্রাসাটি বেসরকারিভাবে চালু করি এবং প্রয়োজনীয় তৎকালীন টি,এন,ও সাহেবের সুপারিশ, মহিলা এম,পি সহ স্থানীয় চেয়ারম্যান-এর সুপারিশ সমন্বিত যাবতীয় ফাইলপত্র তৈরি করে মাদ্রাসা বোর্ডে চলে গেলাম। মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আমার ফাইলটি গ্রহণ পূর্বক বুঝিয়া পাইলাম রাখিয়া দিয়া recived copy আমার হাতে দিলেন। আরো পরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখলেন, "পরিদর্শনের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল"। পরে সমস্যাটি লেগে গেল অন্য জায়গায়। যখন আমরা পরিদর্শনের অপেক্ষা করতেছিলাম ও বিলম্ব দেখে আবারো খোঁজ নিলাম। বুঝতে পারলাম ঘুষ না দিলে পরিদর্শন করা হবে না। আমার নিজস্ব কোন বিদ্যার বহর নেই। ক্ষুদ্র অনুভূতিতে যে চেতনা বা ধর্মীয় জ্ঞান ছিল তাতে বিবেক বাধা দিল। হাদীস শরীফে রয়েছে;

'আর রাশো ওয়াল মুরতাশা ফিন নার'। অর্থাৎ উৎকোচ গ্রহণকারী ও উৎকোচদাতা উভয়েই জাহান্নামী হবে।

তখন ভাবতে লাগলাম যেখানে ভিত্তিটাই অবৈধ সেখানে লেখাপড়া শিখে ছাত্রদের কাগজ কলমের জ্ঞান আসতে পারে কিন্তু তাকওয়ার ক্ষেত্রে বিশাল ব্যবধান রহিবে। আমার উদ্দেশ্য ছিল এলেমের পাশাপাশি পরহেজগারিতা ও তাকওয়া শিক্ষা দান। কিন্তু আমি যে ঘুষ দেব সেই ঘুষের টাকা পাব কোথায়? বাধ্য হয়ে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে টাকার বিনিময়ে চাকুরি দিতে হবে। প্রকৃত মেধাসম্পন্ন শিক্ষক ঘুষ দিয়ে চাকুরি গ্রহণ করবেন না। ইহাতে দুটি ক্ষতি হবে।

১। লেখাপড়াটা মাঠে মারা পড়বে তখন নকলের মহড়া চলবে ও জ্ঞানপিপাসু ছেলেরা অযোগ্য শিক্ষকের সাহচর্যে নামধারী আলেম হবে। এদের দ্বারায় ভবিষ্যতে ইমান, এখলাছ, একিন, তাকওয়ার অভাব পড়বে। তখন সমাজটি পূর্বের ন্যায় অজানা অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ রহিবে।

২। আমি নিজে শিক্ষকদের কাছে ঘুষ গ্রহণ করলে এই অপরাধে দোষী হব। তবে আমার সঙ্গে থেকে এসমস্ত কাজে মুক্তি আফজাল ঘুষ গ্রহণের বুদ্ধি দিয়েছিল।

সে আমাকে ঢাকা হতে ফেরাকালীন পরামর্শ দিতেছিল; কোন চিন্তা নাই আমরা যদি পূর্ণ teacher staff সহ যাবতীয় কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে কিছু করে টাকা গ্রহণ করি তাহলে বোর্ডে প্রয়োজনীয় ঘুষ দিয়ে মাদ্রাসাটি তৈরি করেও প্রচুর টাকা বেঁচে যাবে। আমরা লাভবান হব। ইতোমধ্যে মুক্তি আফজাল উত্তর সিঙ্গেরগাড়ীর বুদ্দাহ ওস্তাদজীর ছেলে নূরুল হুদার কাছে কিছু টাকাও গ্রহণ করেছে। যার পরিমাণ প্রাথমিক পর্যায়ে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র। এভাবে আমাদের মসজিদের ইমাম সহ চতুর্দিক থেকে প্রস্তাব আসতে শুরু করল। এমনকি প্রতিযোগিতামূলক একে অন্যের চেয়ে বেশি দিবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছিল। তখন আমার ঘুম ধরে না। অন্তরে একটি ধিক্কার সৃষ্টি হল। এটা কি ইসলাম যা ধর্মসঙ্গত নয়। ইমামুল ক্বিবলাতাইন জনাব হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো অন্ধকারের সাথে আলোর, মিথ্যার সাথে সত্যের আপোষ করতেন না। তখন আমি জানতে পেরে বিবেকের দংশনে মুক্তি আফজালের গ্রহণ করা টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দিতে বললাম। অতঃপর সে ফেরৎ দিল। আমার এলাকার জনতাকে জানিয়ে দিলাম "ঘুষ দিয়ে, ঘুষ গ্রহণ করে লাভবান হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় সুতরাং দেখি বৈধভাবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা যায় কি না।" এবং তদঅবধি এ পর্যন্ত একটি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে চালু রেখেছি। যার ফলস্বরূপ আমার এই অন্ধকার সমাজে ক্ষীণ হলেও দ্বীনের আলো ছড়িয়েছে। কিন্তু অপরদিকে ধুরন্ধর মুক্তি আফজাল ভাবল আমার সঙ্গে সহযোগিতায় থাকলে ফকির হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না, বিবেচনা করে আব্দুস ছালাম বেলু সাহেবের সঙ্গে আমার এই দুর্বলতার কথাটি অবগত করিয়ে খুব দ্রুত নিজ টাকা পয়সায় ফাইল পত্র তৈরি করে, বোর্ডে প্রচুর ঘুষ দিয়ে মাদ্রাসার ফাণ্ডে যে টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয় তা সকাল ৯ টায় ওকড়াবাড়ি কৃষি ব্যাংকে জমা দিয়ে দুপুর ১২টার সময় বোর্ডে তাহা প্রদর্শিত করা হল। এভাবে অলৌকিক কাজটি ঘটে গেল।

এমন কি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড যখন প্রাথমিক স্বীকৃতি প্রদান করেন তখন সম্পূর্ণ জমিজমাও দলিল করে দেয়া হয়নি। হায়রে ঘুষের কেরামতি। নবীগণের

মোজেজাও একটু বিলম্ব হত কিন্তু ঘুষের গুণে কোন স্তরে বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে: শিক্ষক নেই, ছাত্র নেই, ঘরবাড়ি নেই, এমন অবস্থায় একটি মাদ্রাসা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হল। ধুরন্ধর আফজালের বুদ্ধিতে ক্রমশঃ চতুর্দিক থেকে শিক্ষক নিয়োগের ধুম পড়ে গেল। প্রচুর টাকা কামাই করে প্রয়োজনীয় টাকা বোর্ডে ঘুষ দিয়ে বাকি টাকাগুলো নিজেরা ভোগ করছে। এমনকি কোন কোন শিক্ষক ও তার অভিভাবককে এমন চাপ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের নতুন মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে তোমাদের দেয় টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং চাকুরির ক্ষেত্রে যত সম্ভব সমস্যা তৈরি করা যায় তা করবো। মাদ্রাসাটিতে বোর্ডের আওতায় পরীক্ষা দেয়ার মতো কোন ছাত্র ছিল না। তখন মাগুড়া দোলাপাড়া মাদ্রাসা হতে মশারুর বেটা চিকা ও তবারক আলীর বেটা সাইফুলকে নিয়ে এসে নিজ খরচে এই মাদ্রাসার নাম দিয়ে ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। ফলতঃ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রমাণিত হল যে, এটি একটি চলতি চালু মাদ্রাসা। কিন্ত ছেলে দুটির প্রাথমিক শিক্ষা আমার অবৈতনিক মাদ্রাসা হতে শুরু হয়েছিল। এমন কি বোর্ডকে ফাঁকি দেয়ার জন্য তারা মিথ্যা ছাত্র-ছাত্রীর নাম দিয়ে উপবৃত্তি গ্রহণ পূর্বক হ-য-ব-র-ল হিসাবে দেখিয়ে অফিসারদেরকে কিছু ভাগ দিয়ে বিষয়টা সহজ করে নিয়ে পরে আস্তে আস্তে মাদ্রাসা চালু রেখেছে। কিন্ত কথা হলো আমার নিজস্ব পাণ্ডিত্ব এলেমের দৌরাত্ম নাই বিবেচনা করিয়া মশারুর বেটা চিকা আমাদের মসজিদের জনৈক মুছল্লি আবেদ আলীকে একটা আনসার বিড়ির প্যাকেটের খোলস দেয়, আর বলে ইহা তোমাদের হুজুরকে দিও। এর মধ্যে কিছু কথা লেখা আছে তা যেন পাঠ করে দেখে। মোঃ আবেদ আলী এশার ওয়াক্তে নামাজ পড়তে আসলে কাগজটি পেশ করেন। আমি রাত্রের আলোতে চশমা ছাড়া কিছু পড়তে পারি না, তখন ইমাম সাহেবকে পড়তে বললাম। এতে লেখা ছিল সুরা তওবার ১০৯/১১০/১১১ নম্বর আয়াত পড়িয়া দেখুন। মনে হয় আমি কোন দিন তা দেখি নাই। তখন চিকাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, এটা আমি দেই নাই। এটা হবর ঢেকির বেটা আসাদুল মুন্সি আমাকে দিতে বলেছেন। কথা হলো আয়াতগুলোতে কী আছে? বিষয়টা জানা দরকার ভাবিয়া বিভিন্ন বই পুস্তক ঘাটতে শুরু করলাম। যদিও আমার পূর্ব হতে কিছু জানা ছিল। পরে আমি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন সহ বিভিন্ন তাফসীর-এর সাহায্য গ্রহণ করি। কিন্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি ছাপিয়ে সর্বসত্য নিজের কাছে না রেখে সুধী সমাজকে অবহিত করার জন্য বিনামূল্যে বিতরণের ঘোষণা দেই এবং যে কেহ ইচ্ছা করলে ইহার হুবহু অনুলিপি ছাপিয়ে আগ্রহী পাঠকমহলকে জানাতে পারেন। এতে যেসব কেতাবের সাহায্য গ্রহণ করেছি তাদের কাছে বিনয়ের সুরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দেখা যাক আয়াতগুলোতে কী আছে-

১০৭ঃ যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য, কুফরী করার জন্য, মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং ঐ ব্যক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে পূর্ব থেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে এবং তারা অবশ্যই কসম করে বলবে- আমরা তো কেবল মঙ্গলই চেয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।

১০৮ঃ আপনি কখনও সে মসজিদে দাঁড়াবেন না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত সে মসজিদই আপনার জন্য দাঁড়াবার অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা খুব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

১০৯ঃ তবে কি সে ব্যক্তি উত্তম যে স্বীয় গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্ ভীতির উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উপর স্থাপন করেছে না কি ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছে এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায়, ফলে সে গৃহ তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ্ জালিম কওমকে পথ দেখান না।

১১০ঃ তাদের ইমারত যা তারা নির্মাণ করেছে তাদের অন্তরে সর্বদা খটকা সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা।

যাহার ব্যাখ্যায় এরূপ বলা আছেঃ-

জনাব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিযরতের পর মদিনা মনোয়ারায় মসজিদে কুবা নির্মাণ করেছিলেন যা হুজুরে পাক (সাঃ) পদস্পর্শে মহিমান্বিত ও সকলের কাছে একটি বরকতময় মসজিদ হিসাবে পরিণত হয়েছিল এবং দেশ বিদেশ হতে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ মসজিদে দীদার লাভ করে ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিলেন। এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের পরিধি বৃদ্ধিতে কিছু সংখ্যক বিধর্মী বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর এর নেতৃত্বে একটি কুচক্রী মহল চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যাতে ইমাম হিসাবে আবু আমের বাহিবকে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল। ইসলামকে বিনষ্ট করার জন্য ইসলামিক ছুরৎ ধারণ করে নিজ মহল্লায় একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করে হুজুর (সাঃ)কে এরূপে আহবান করলেন যে, "আপনি এ মসজিদে এসে জামায়াত শুরু করলে আমরা ইসলাম গ্রহণ এবং নিয়মিত জামায়াত চালু রাখব।" তখন যুদ্ধ তাবুকের জন্য হুজুর পাক (দঃ) প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হুজুর পাক তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরল মনে বললেন, "যুদ্ধ হতে ফিরে এসে ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাল্লাহ।" ইতোমধ্যে চক্রান্তকারী বিধর্মী অন্য রাষ্ট্র হইতে অসংখ্য

দেবেন তার বিনিময়ে আল্লাহ্ জান্নাতে তার জন্য গৃহ বানিয়ে দিবেন। অন্য বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত কথার সংযোজন আছে, যেমন যদি সে আল্লাহর দর্শন কামনা করে তবে যেন মসজিদ নির্মাণ করে। (corpus Juris di Zaid b. Ali সম্পা. Griffini সংখ্যা ২৭৬, আল বুখারী সালাঃ বাব ৬৫, মুসলিম মসজিদ হাদীস ৪; মুহদ হাদীস ২ আল মাকরিযী ৪খ, ৩৬)। কোন কোন সময় স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ পেয়েও মসজিদ নির্মাণ করা হতো। এই জাতীয় একটি বর্ণনা আল সামহুদী ৫৫৭ হিজরীর মদীনা মুনাওয়ারা সম্পর্কে নকল করেছেন। দামিসকের একটি মসজিদ সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। রাসুল্লাল্লাহ্ (দঃ) এর সাথে সাক্ষাত লাভের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ একটি মসজিদ নির্মিত হয়। (আল মাদরা সাতুশ শারীফিয়্যাঃ আল মাকরিয়া ৪খ. ২০৯) মসজিদ নির্মাণ করে দেয়ার কাজ শাসন কর্তৃপক্ষেরই বিশেষ দায়িত্ব। ইসলামের সূচনাকাল হতেই শাসকবর্গ এদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যেন ইসলামের প্রসার ও বিস্তৃতির সাথে সাথে নুতন নুতন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। হিজরী প্রায ১০০০ সালে মেডিয়া এর শাসনকর্তা বাদর ইবনে হাসমাবিয়া সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তিন হাজার মসজিদ ও মুসাফিরখানা নির্মাণ করেছিলেন। (Mez, Die, Renaissance des Islamic ১৯২২ খৃঃ পৃঃ ২৪) স্মৃতিফলক, ভৌগোলিক ফলক, লিপি ও বিভিন্ন শহরের নিদর্শনাদী হতে সুস্পষ্টভাবে ধারণা করা যায় যে, এ জাতীয় মসজিদ কী পরিমাণে নির্মিত হয়েছিল।

৪০৩ হিজরী সালে আল হাকীম মিশরের কায়রো নগরীর মসজিদ সংখ্যা গণনা করাইলে জানা যায় যে, তথায় আট শত মসজিদ ছিল। (আল মাকরিযী ৪খ, ২৬৪) আল কুদাঈমে ৪৫৪/১০৬২ ও মসজিদ গণনা করান। এ গণনায় মসজিদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার বা ছত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়। (যাকুত ৩খ. ৯০১ ইবনে দুকমাক সম্পাদিত কাল্পনিক বলে মনে হয়। সম্ভবত আল্‌ফ = হাজার শব্দের পূর্বে এবং ৩৬ শব্দটি বাদ পড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ হাজার ও ছত্রিশ (১০৩৬) বলাই উদ্দেশ্য। আল মাকরিযীর ন্যায় ইবনুল মুতাওয়াজ (মৃ ৭৩০ হিঃ) ৪৮০টি মসজিদ গণনা করেছেন। ইবন দুকমাক (অনুঃ ৮০০হিঃ) জামি মসজিদের অসম্পূর্ণ তালিকা ছাড়াও ৪৭২টি মসজিদের আরো একটি তালিকা দিয়াছেন। যাতে তিনি মাদরাসা ও খানকাহ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। আল মাকরিযীর বর্ণিত সংখ্যা ইহার চেয়েও কম। বাগদাদের ত্রিশ হাজার মসজিদের কাল্পনিক সংখ্যা অনেক পূর্বে অর্থাৎ য়াকুবীর সময়ে দেখা যায়। (B.G.A ৭খ. ২৫০) ইবন জুবায়ের আলেকজান্দ্রিয়ার মসজিদের সংখ্যা যে বার হাজার বা আট হাজার বলেছেন (পৃঃ ৪৩) তাহাও অতিরঞ্জিত। বসরায় জিয়াদ ৭টি মসজিদ নির্মাণ করেন। (B.G.A ৫খ. ১৯১)। পরবর্তী সময়ে মসজিদের সংখ্যা এখানে

দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। কিন্তু সম্ভবত এখানেও সংখ্যা অতিরঞ্জিত করে অর্থাৎ ৭০০০ বলা হয়। (B.G.A ৭খ. ৩৬১) ইবনে আসাকির মৃ ৫৭১/১১৭৬ দামিশক শহরের অভ্যন্তরে ২৪১টি এবং শহরের বাহিরে ১৪৮টি মসজিদের সংখ্যার কথা বলেছেন। (J.A সিরিজ ৭,৯ পৃঃ ৩৮৩) ইবনে হাওকল তাদমুর (Palmyra) এ ৩০০ এর বেশি এবং তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে ২০০ মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন। কোন কোন গলিতে ২০টি পর্যন্ত মসজিদ ছিল। যার একটি হতে অন্যটির দূরত্ব অতি সামান্যই ছিল। তবুও এই সংখ্যাধিক্য প্রশংসনীয় মনে করা হয় নি। প্রত্যেক লোকই নিজস্ব স্বতন্ত্র মসজিদ নির্মাণ করতে চাইত য়াকুত ১খ. ৭১৯ ৩খ ৪০৯, ৪১০) প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের রুচি এভাবেই গড়ে উঠেছিল। যা'কুবী দফতরে আনবার এলাকার মসজিদ অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল (B.G.A ৭খ. ২৪৫) এইরূপে কতিপয় বিখ্যাত বিশিষ্ট আলিমদের নিজস্ব পৃথক পৃথক মসজিদ ছিল। এমনও হত যে, কোন কোন বেসরকারী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করিয়ে দিতেন। সালে তাজুদ-দীজদ তৈরি করেন এবং উহার মধ্যে একটি পৃথক কক্ষও তৈরি করান যাতে তিনি একাই স্বালাত আদায় করতেন মুরাকাবার সময় কাটাতেন। (আল মাকরিযী ৪খ. ৯০) যেমন বাংলার সোনা মসজিদ ও কুসুম্বা মসজিদ। এভাবে কোন মসজিদ নির্মিত হলে সাধারণত উহার প্রতিষ্ঠাতার নামে উহার নামকরণ করা হত। এককভাবে স্মৃতি রক্ষার্থে যে মসজিদ ও মাযার নির্মিত হত, উহা সেই স্মরণীয় ব্যক্তির নামেই আখ্যায়িত হত। কখনও বা মসজিদ এমন দ্বীনদার আবিদের নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যেত। যিনি সেই মসজিদে অবস্থান করেছেন। (আল মাকরিযী ৪খ, ৯৭, ২৬৫ পৃঃ) মাদরাসা ও প্রধান শিক্ষক বা অন্য কোন শিক্ষকের নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যেত। পৃ. গ্র. ৪খ. ২৩৫, য়াকুত আল উদাবা ৭খ ৮২) এমনও হত যে, মসজিদের নামকরণ উহার অবস্থা স্থল বা ইমারতের কোন বিশেষ অংশের নামে করা হত।

প্রসঙ্গত বলা যায়, মসজিদুল নব্বী চত্বর সংলগ্ন চতুর্দিকে বেস্টনীতে কয়েকটি মসজিদ আমি নিজে চোখে দেখেছি। তন্মধ্যে হেরেম সংলগ্ন পশ্চিম দিকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর মসজিদ, একটু দক্ষিণে কয়েক'শ ফুট পরে মসজিদে আলী (রাঃ) তার একটু দক্ষিণে মসজিদে গামারী সামান্য একটু পরেই হযরত উমর ফারুক (রাঃ) মসজিদ। এতদসমূহ মসজিদে নব্বীর অতি সন্নিকটে। এতে বুঝা যায় এই মসজিদগুলি তেনাদের নিজ নিজ আবাসস্থল ছিল। হুজুর (সাঃ) এর নির্দেশে নিজ গৃহে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। অদ্যাবধি মসজিদরূপে চিহ্নিত আছেন। মসজিদুন নব্বী হতে বাসায় যাওয়ার পথে খুব নিকটে একটি মসজিদ পরিলক্ষিত হয়। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে মসজিদে কাতেব হিসাবে পরিচয় পাওয়া যায়। শহরের ভিতরে হযরত ওসমান (রাঃ) এর মসজিদ পাওয়া যায়। এটি তেনার নিজ বাসভবন ছিল। এই মসজিদেই তিনি

শাহাদাৎ বরণ করেছেন। এর একটু পূর্ব দিকে মসজিদে বেলাল (রাঃ) অবস্থিত। যেখান হতে খুব সহজেই মসজিদে নব্বীর পূর্ব দক্ষিণ প্রবেশ পথ বাবে বেলাল যাওয়া যায়। বাবে বেলালটি বাবে জিব্রাইলের সন্নিকটে। এই পথে সহজেই আসহাবে সুফফা নামক জায়গায় প্রবেশ করা যায়। পবিত্র পুণ্যভূমি মক্কা বিজয়ের পর মক্কা মোয়াজ্জেমায় মসজিদুর রাঃ যেখানে মক্কা বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

ইসলামী বিশ্বকোষ ১৮'শ খন্ডের ৪৬৭ পৃঃ ৭ লাইনের পর উদ্ধৃত অংশ তুলে ধরা হলঃ

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কিত বেশ কিছু মসজিদ রয়েছে। যেমনঃ মদীনার মসজিদুল বালাগাঃ ইহাকে মসজিদ-ই-বানু জাফর ও সুফরাই পয়গম্বরও বলা হয়। এখানে রাসুল (সঃ) এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছিলেন। মসজিদুল ইজাবাঃ যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দোয়া কবুল হয়েছিল। মসজিদুল ফাতহঃ মক্কা বিজয়ের স্মরণিকা হিসাবে নির্মিত মসজিদ এভাবে মক্কা মুকাররমার বহু স্থান স্বাভাবিকভাবেই রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর সম্পর্কের কারণে সম্মানিত হয় এবং এই সকল স্থানকে সালাতের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা হত থাকে। কথিত আছে যে, বায়তুল্লাহর পরে সর্বাধিক সম্মানিত স্থান হযরত খাদীজা (রাঃ) এর গৃহ যাকে মাওলাদুস সায়্যিদাঃ ফাতিমা-ফাতিমার জন্মস্থান ও বলা হয়। (কেননা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের পূর্ব জীবনের বেশ কয়েকটি বৎসর এখানে অতিবাহিত করেন এবং এই ঘরেই তাঁহার অন্যান্য সন্তান ছাড়াও সর্বকনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।) এবং এই ঘরে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হিযরত পর্যন্ত অবস্থান করেন। পরে আলী (রাঃ) এর ভাই আকিল ইহা হস্তগত করেন এবং আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ইহাকে ক্রয় করে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। (Chroniken d. Stadi Mekka West enfeld ১খ. ৪৬৩. ৩খ ৪৩৮, ৪৪০) ইহার পরবর্তী মর্যাদা সেই গৃহের যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের অল্প পূর্বে অবস্থানের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। হারুনুর রশীদের মাতা খাযযুরান ১৭১ হিঃ সালে যখন হজ্জ করতে আসেন তখন এই গৃহকে ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করিয়ে দেন। তিনি মাওলাদুন নব্বী (নবীর ভূমিষ্ট হওয়ার স্থান) ও ক্রয় করে মসজিদ তৈরি করে দেন (পৃ. গ্র. ১খ. ৪৩২, ৩খ ৪৩৯) কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সত্তার সহিত সম্পর্কিত ভবনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নতুন নতুন স্থান উহার সহিত সংযোজিত হতে থাকে। শুধু রাসুলের (সাঃ) সঙ্গে নয় বরং সে সকল স্থানেরও সন্ধান করা হয় যাহাদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবীদেরও কিছুটা সম্পর্ক ছিল। এই জাতীয় স্থান নিম্নরূপঃ

হামযা, উমার ও আলী (রাঃ) এর জন্মস্থান (Chron Mekka ৫), উম্মুল মোমেনীন মারিয়া, কিতবিয়া (রাঃ) এর ঘর যিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পুত্র হযরত ইবরাহীম এর মাতা এবং যাহার নামে মদীনায় একটি মসজিদও ছিল। (Wustenfeld, Medina পৃঃ ১৩৩) সম্ভবত শাররা-ই-ইব্রাহিম মসজিদ যেখানে হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) এর জন্ম হয়েছিল। ইহা ব্যতীত ছিল মসজিদ-ই-খাদীজা (রাঃ) (পৃ.গ্র. ১খ ৩২৪) মসজিদ-ই-আইশা (রাঃ) (পৃ.গ্র. ৩খ ৫৪৪) এবং মক্কার এক সংকীর্ণ উপত্যকায় মসজিদ-ই-কুবুল-ই-দু'আ নামে আরো একটি মসজিদ ছিল যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সালাত পড়িয়াছিলেন। (পৃ. গ্র. ১খ. ৪৬৪. ৩খ ৪৫৩), মসজিদুর রাযা যেখানে মক্কা বিজয়ের সময় আপন দলের পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন। (পৃ.গ্র. ২খ ৬৮, ৭১, ৩খ ১৩, ৪৫৩) মাসজিদুল বায়আঃ যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সর্বপ্রথম মদীনাবাসীদের বায়আত করান। পৃ.গ্র. ১খ ৪২৮, ৬খ. ৪৪১) আরাফাতেও একটি মসজিদ হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) নামে আছে বলিয়া খ্যাত (পৃ. গ্র. ১খ ৪১৫, ৪২৫) এবং এই নামের আর একটি মসজিদ মক্কার উপকণ্ঠে আয-যাহিরে অবস্থিত (ইবন-জুবায়ের আর রিহালাঃ ১৯০৭ খৃ. পৃ. ১১২) পরবর্তীকালে এই সকল স্মৃতিবিজড়িত মসজিদের সাথে আরো মসজিদ সংযোজিত হয় যেমন মসজিদে আবু বকর (রাঃ), মসজিদে বিলাল (রাঃ), মসজিদে শাককিল কামার ইত্যাদি (দ্র. ইবন জুবায়ের আর রিহালা পৃঃ ১১৪ প. B6A ৩খ ১০২ পৃ. Snouck Hurgrouje মক্কা ২খ, ২৭, আল বাতানুনী, আর রিহলাতুল জারিয়াহ কায়রো ১৩২৯ হিঃ পৃঃ ৫২) এইরূপে মুসলিমগণ হিজামে বিপুল সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করে। যেইগুলি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহার আহলি বায়ত ও সাহাবীগণের সাথে সম্পর্কের কারণে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

এরূপভাবে জরিপ করলে নবী করিম (সাঃ) থেকে শুরু করে এ অবধি সারা মুসলিম জাহানে সাহাবী তাবে-তাবেঈন, মুসতাহেদীন, সলফে সালেহীন, ইমাম, বুজুর্গানে দ্বীন ও এতদ্বসমূহের পবিত্র পদস্পর্শে বরকতময় মসজিদ হিসাব করে দেখলে কলেবর বৃদ্ধি হয়ে volume বই সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) বাংলা ভারতে মসজিদ আন্দোলন করে প্রতি মহল্লায় আনাচে-কানাচে মসজিদ ও মক্তব ছড়িয়ে দিয়েছেন। যার অবদান অনস্বীকার্য। যেখানে আগে মসজিদের দূরত্বের কারণে সেকালের লোকেরা নামাজকে নিস্প্রয়োজন মনে করত, তাহা তেনারা অর্থাৎ অলী আল্লাহগণ অধিক মসজিদ বানাইয়া মানুষের ভ্রম ভাঙ্গেন।

বিশেষ করে অতীতে উত্তর ও দক্ষিণ সিঙ্গের গাড়ীতে শুধুমাত্র একটি মসজিদ ছিল। যাহা উত্তর সিঙ্গেরগাড়ীর জুম্মাপাড়ায় অবস্থিত। কালের চক্রে দঃ

সিঙ্গেরগাড়ীর জহুরিয়া দরবার শরীফে ২য় মসজিদ সৃষ্টি হয় এবং পরে জহুরিয়া শরীফের মসজিদ থেকে চৌধুরী পাড়ায় মসজিদ সৃষ্টি হয়। চৌধুরী পাড়ার মসজিদ থেকে দীগলের জুমআ মাঝপাড়ায় ও চৌধুরী বাড়ী সংলগ্ন পূর্ব দিকে ওলংয়ের জুম'আ সৃষ্টি হয়। এদিকে জহুরিয়া শরীফের মসজিদ থেকে ও আব্বাস সরকারের মসজিদ থেকে মুসল্লিরা ভাগাভাগি তছিরের জুমআ সৃষ্টি করে। এবং সিঙ্গেরগাড়ীতে প্রায় ৩৩ এর বেশি মসজিদ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটি মসজিদ হইতে এতগুলি মসজিদ সৃষ্টি হওয়ায় দ্বিধাদন্দ্বের কোন আলামত পাওয়া যায় নাই। দিরার বা জেরার মসজিদগুলি পরিণত হইলে আগে ও এ সমস্ত মসজিদকে পুড়াইয়া দেওয়া উচিত ছিল। যেহেতু এই মসজিদগুলোতে কোন বিধর্মীর চক্রান্ত, ধর্মীয় নাশকতামূলক আচরণ ও মুসলমানদের স্বার্থে আঘাত হানিয়া কলাকৌশল অবলম্বন করিয়া মুসলমানদের পর্যুদস্ত করার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই শুধুমাত্র নিরাপদে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এলাকায় খোদাভীরু লোকগণ কোন বিতর্কের সৃষ্টি না করিয়া মহান আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় মসজিদ নির্মাণ করেছিল।

ইতঃপূর্বে এ সমস্ত মসজিদ বিভক্ত হওয়ার পেছনে কোন জমির দাবিদার হওয়া, ওয়ারিশয়ানা সূত্রে মালিকানা হওয়া, সহিংসতা, Village politics, ভয়ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি করা হয় নাই তথাপিও তারা নিজ সুবিধার জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। আর আমরা এতদল্লিখিত সমস্যা ছাড়াও নিরাপদে স্বাধীনভাবে নিজ সীমানায় আল্লাহর যমিনে আল্লাহর বান্দাদের নিরাপদ ইবাদতস্থল নির্মাণ করিয়া সকল জনগণের স্বার্থে কোন দাবি দাওয়া বা কোন শর্ত ছাড়াই মসজিদ গৃহ নির্মাণ করিয়াছি। যেখানে অদ্যবধি আশেপাশের জামায়াতের লোকজন সহ আমাদের নিজ গ্রামের মুসল্লিগণের সমাবেশ ঘটে। যে কারণে মসজিদে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদের বাহিরে খোলা আকাশের নীচে লোকেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিতেছেন। কেন এই মসজিদে নামাজ হইবে না প্রতিপক্ষের কাছে আমার জিজ্ঞাসা রহিয়া যাইবে। এই সমস্ত মসজিদে নামাজ হইবে আমাদের ওয়াকফকৃত জমিতে কেন নামাজ হইবে না তা কোরআন, হাদীস, ইজমা, ক্বিয়াস, ভৌগলিক, ঐতিহাসিক সনদাদিসহ প্রমাণ করার আহবান রইল।.

প্রকাশ থাকে যে, পূর্বে যখন একটি মসজিদ ছিল তখন অজ্ঞ সমাজকে কোনোদিন ধর্মের প্রতি আহ্বান করা হত না। তাদের avoed করা হত। আমি ঐ মসজিদের দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট কোন ইমাম মুয়াজ্জিন পর্যন্ত ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত তো দূরের কথা শুক্রবারও যথাসময়ে আযান হত না। যারা হাঁটু গেড়ে কপাল লাগিয়ে জীবনে সিজদা করত না তারা এখন নিয়মিত মুছল্লি। এখন প্রতিযোগিতার মহড়ায় যথেষ্ট মুসল্লি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখন কথা হলো দাবিকৃত জমিটিতে নামাজ দুরস্ত হবে কি না? যেখানে তাহাদের সম্পত্তির দাবী। এমনকি এখনো তাহারা বলে, "আমাদের জমিতে মসজিদ গৃহ নির্মাণ করিয়াছে তা উহা কাহার হুকুমে করিল?" উল্লেখ যে জহুর বাবার রঃ) মাযার সংলগ্ন মসজিদটিতে জহুর বাবা (রঃ) নামাজ পড়েন নাই। এ প্রসঙ্গটি শেষের দিকে আলোচনা করছি।

অপরদিকে প্রচুর টাকা খরচ করে একটি ইমারত তৈরি করার পর যেখানে স্বাধীনচিত্তে ইবাদত করার অধিকার থাকবে না, অহরহ, ঝগড়া ফাসাদ লেগে থাকবে, সহিংসতা সৃষ্টি হয়েছিল এমনকি মারামারি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে, রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা ছিল বা এখনো বিদ্যমান এমতাবস্থায় আমি একটি প্রস্তাব দিলাম উভয়পক্ষে আমরা নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে দেশ বিখ্যাত অভিজ্ঞ আলেম যাহা তোমরা চারজন দিবে আমরা চার জন দিব; বিজ্ঞ আলেমগণ শরিয়তসঙ্গত ফয়সালা টানবেন। প্রস্তাবটি প্রতিপক্ষ প্রত্যাখ্যান করে এরূপ উক্তি করল "আমরা কোন আলেমের সিদ্ধান্ত মানি না; আমরা যাহা করিব তাহাই সঠিক।" এরূপ স্বৈরাচারী আচরণের কারণে মহল্লার মুসল্লিবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন মসজিদটি তৈরি করল। তবে পুরাতন মসজিদটির ক্ষতি হয় নি। বরং পূর্বে যেখানে নিয়মিত আযান ও জামায়াত হত না এখন তাহা স্বাচ্ছন্দ্যে চলতেছে। তাদের ৮/১০ জন লোক নিয়মিত নামাজ আদায় করতেছে। মানুষকে নামাজের জন্য আহ্বান করছে।

শুধুমাত্র ঝগড়া ফাসাদ, হানাহানি, কাটাকাটি, মারামারির ভয় এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমরা অনত্রে সরে পড়লাম। পুরাতন মসজিদটিকে আমরা মানসিক দিক হতে শ্রদ্ধা করতাম কখনও ঘৃণা করতাম না। তা না হলে অবহেলিত পুরাতন মাযার ও মসজিদ ভবনটি যেখানে জীর্ণ-শীর্ণ হয়েছিল তা পুনরায় দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা (১০,৫০,০০০/-) খরচ করে সকল জনগণের সহায়তায় আনন্দের সাথে নির্মাণ করতাম না। কিন্তু কথা হলো নিজের স্বত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তারা জনগণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজ অধিকারে রাখিয়া, যথেচ্ছা ব্যবহার করে হেন ন্যাক্কারজনক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এরপরও তারা মনে করে জনগণ তাদের অধীনস্থ থেকে তাদের হুকুমের তাবেদারী হবে।

আল্লাহর ঘর, মহান অলীর সমাধিস্থল সংলগ্ন মসজিদটি হবার কারণে জনগণ শেষ বারের মত মসজিদটিতে ও মাযারে উপস্থিত হয়ে বিনয়ের স্বরে রোদন করছিল। মসজিদ ও মাযারের কাছে এরূপ বিদায় গ্রহণ করল যে, আমরা ভুলি নাই ও ভুলবো না। শুধু অন্যত্র সরে গিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার ইবাদত ও তাঁরই

অলীর স্মরণে আপনারই নাম অনুসারে সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া শরীফ বাইতুন্নুর শাহী মসজিদ নির্মাণ করতে আরজি পেশ করলাম।

আধ্যাত্মিক জগতে বেলায়েতের ক্ষেত্রে দায়রাসমূহের মধ্যে "রোইয়ামা ছাদেকা" নামক একটি দায়রা রয়েছে। যার অর্থ নবীগণ অলীগণের স্বপ্ন সত্য। এতে অলীগণের সুরত ধারণ করে শয়তান ধোকা দিতে পারবে না। নবী পাক সরোয়ারে কায়েনাত মুফাখখারে মৌজুদাত আহমদে মুজতবা মোহাম্মদে মোস্তফা ইমামুল ক্বিবলাতাইন রাহমাতাল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের এক ভাগের সমান।

একটি স্বপ্নঃ

নতুন মসজিদের মুসল্লিবৃন্দসহ আমার মধ্যেও একটু সন্দেহের জাল রেখাপাত করেছিল যাহা চাপাভাবে ছিল। আমি ভেবেছিলাম জহুরুল হক বাবার (রঃ) সমাধিস্থল সংলগ্ন মসজিদ ভবনটি নির্মাণ করা কি বেয়াদবী হয়ে গেল? (কারণ জহুর বাবা (রঃ) কণিষ্ঠ পুত্র আফতাবুজ্জামান সাহেব বলেন, জহুর বাবা (রঃ) এগুলো চায় না) না ওখান থেকে সরে পড়াতে জহুর বাবা (রঃ) মনক্ষুণ্ন হলেন। এরূপভাবে অজানা চিন্তার জাল মনকে আচ্ছাদিত করতেছিল। হঠাৎ একদিন রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখতেছিলাম তোজাম্মেল হোসেন দাদাজান আমাকে হাত ধরে পুরাতন মসজিদ ও মাযারের কাছে যেতে অনুরোধ করল এবং আমি তেনার সাথে গিয়ে জহুর বাবার (রঃ) মাযারের পার্শ্বে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে অনুরোধ করতেছিলেন এভাবে "ভাইয়া আমরাই আমরাই ইহা ঘরে বসিয়া সংশোধন করিয়া লইব। বিষয়টা জহুর বাবাকে (রঃ) দিও না। আমি তো জানি তুমি একক প্রচেষ্টায় সকলের সহযোগিতায় ঘরটি নির্মাণ করিয়াছ। কিন্তু খুব ক্ষুদ্র হলেও আমার ছেলেতো বাকি কাজটি করার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং তোমরা চাচা ভাতিজা মিলে মিশে বাকি কাজটি কর।" তখন আমি উক্তি করলাম, "দাদাজান আমি তো আল্লাহর নামে নতুন মসজিদ ভবনটি Wills করে দিয়েছি। কিরূপভাবে আল্লাহর কাছে ফেরৎ চাইব। আল্লাহ কি ফেরৎ দলিল করিয়া দিবেন। পারেন আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেন। আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতে হঠাৎ করে পবিত্র মাযার শরীফ হতে জহুর বাবা (রঃ) আমাকে ডেকে বলছেন, "উহার সহিত কি কথা বলিতেছো। তুমি আমার কাছে আসো।" তৎশ্রবণে আমি মাজারের নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি আরো বলতেছিলেন "তোমার নতুন মসজিদে মাইক সেট করে mouth পিচটি আমাকে দাও। আমি উহা উদ্বোধন করবো এবং জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখব।" তখন আমি মাজারের এক কর্ণার দিয়ে জহুর বাবার (রঃ) হাতে Mouth পিচটি দিয়ে তেনার নির্দেশে নতুন মসজিদ ভবনে চলে যাই। তখন তিনি মাইকে 'ফু' দিয়ে

শব্দ পরিবহন যন্ত্রটি পরীক্ষা করতেছিলেন। ইতোমধ্যে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে "আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" আওয়াজ শুনে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। বাদ ফজর আমার বড় ছেলের কাছে স্বপ্নের বিবরণ দিতেছিলাম ইতোমধ্যে ডাঃ মোঃ জোবায়ের হোসেন মজনু সাহেব তথায় উপস্থিত হয়ে বলতেছেন, "বাবা শামসুল গতদ্য রাতে আমি স্বপ্নে দেখতেছি আমার বাবা আলহাজ্ব মোজম্মেল হোসেন সাহেব নতুন মসজিদে ফজরের নামাজের ইমামতি করে এরূপ বক্তব্য দিতেছিলেন- "পুরাতন মসজিদটিও থাকবে যেহেতু পুরাতন মসজিদটি একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হয় নি আর নতুন মসজিদটি আল্লাহপাক কবুল করেছেন বিধায় এ মসজিদের ইমামতিসহ যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম।" তবে যখন আমার স্বপ্নে জহুর বাবার (রঃ) দিদার লাভ হয়েছিল তখন পার্শ্বে পাগলা দাদাও (রঃ) নিজ কবরে বসে জহুর বাবার (রঃ) এ উক্তিগুলো শ্রবণ করতেছিলেন। গত বছর মসজিদের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ নির্মাণের পূর্বে ৪ঠা রমজান আমার বড় ছেলেকে এরূপ আরেকটি স্বপ্ন দেখান হয়েছে। জহুর বাবা, পাগলা দাদা উভয়ের মাজার শরীফ উন্মোচন করে ভিতরের অবস্থা দেখাল যে, তেনারা সুসজ্জিত এক শাহী মহলে অবস্থান করছেন যদিও বাহ্যিক অবস্থাটা জীর্ণশীর্ণ ছিল। এবং এরূপ স্বপ্ন দেখে মর্মানুভূতিতে নাড়া দিয়েছিল যে, আমাদের মাজার মসজিদ গৃহটি নির্মাণ না করা বেয়াদবী হচ্ছে। আমার বড় ছেলের মুখে স্বপ্নের কথা শ্রবণ করে ভাবলাম খুব দ্রুত কাজটি করা দরকার এবং কোন কালবিলম্ব না করে খুব দ্রুত কাজটি আরম্ভ করলাম। তখন কাহারও বাধা, বিপত্তি, আপত্তি বা জমির দাবিদার হওয়ার উক্তি শুনতে পাই নি। দীর্ঘ পাঁচ মাস ব্যাপী কাজ চলতেছিল এবং আবেদনকৃত সাইনবোর্ডটিও ছিল এতে কেহই কোন আপত্তি না করে নামাজ আদায় করতেছিলেন। মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ভেবে জায়গার দাবিদার হয়ে হট্টগোল সৃষ্টি করে তাদের সমঅধিকারের কথা প্রকাশ করল। একটি জামায়াত ভেঙ্গে দুটি হলে পুরাতন মসজিদের দায়-দায়িত্ব আঃ সালাম বেলু সাহেব, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাদশা মিঞা, মোঃ আবু রায়হান, আহাম্মদ হোসেন, ডাঃ মোঃ আঃ রশীদ, রাজা মিঞা, রফিকুল ইসলাম বসুনিয়া জোরপূর্বক গ্রহণ করল এবং হারাহারি সূত্রে সকলে মিলে অবশিষ্ট কাজটি সমাধা করবে কিন্তু কেহই চাঁদা দিতেছে না। এখন বেলু সাহেব বিপাকে পড়ে এরূপ উক্তি করছে যে, শামসুলকে আগে হটানো ভুল হয়েছে; সব কাজ শেষ হয়ে গেলে তারপর তাহাকে হটিয়ে দিলে আমাদের কোন আর ঝামেলা থাকত না। পাঠক! বিষয়টা একটু ভেবে দেখলে ইহা সহজে অনুমেয় হবে যে, এই হট্টগোলটা করে আমাকে হটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। কিন্তু উত্তেজনাবশতঃ একটু [illegible]ম হয়েছে এখন এটি ভেবে আফসোস করতেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিবছরই ১লা এপ্রিলে অনেকে হাসি-তামাশায় মেতে উঠে। খালি চিঠি পোস্ট করে। মিথ্যা টেলিফোন করে। আরো কত আজব আজব রঙ্গতামাশায় একে অন্যকে প্রতারণা করে। কিন্তু কি কারণে এই উৎসব তাহা কি আমরা জানি? এপ্রিলের এই প্রথম দিনটিতে স্পেনের খ্রিস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড মুসলমানদের শান্তির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৭ লক্ষ মুসলমানকে মসজিদে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে কয়েকজন ব্যতীত সবাই মারা যায়। খ্রীস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডের নেতৃত্বে স্পেনীয় মুসলমানদের (Fool অর্থাৎ বোকা) ফুল বানানোর সেই নিষ্ঠুর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য খ্রীস্টান সমাজ তখন হতে এই উৎসব পালন করে। ভাগ্যের পরিহাস সে উৎসবে আজ উল্লাসের সাথে শরীক হয় মুসলমানরাও।

-এ. এম. নাসির উদ্দিন
২য় বর্ষ ইতিহাস বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম নিধনকারী, ইসলাম বিনষ্টকারী, ষড়যন্ত্রের আকড়া হিসাবে যে সমস্ত নামধারী মসজিদ তৈরি করে বিধর্মীদের সহযোগিতায় জাল পেতে ছদ্মবেশী মুখোশধারী ইসলামের পরিচয় দিতে ইসলামে ঘুণ ধরাবার চেষ্টা করে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান মসজিদ হিসাবে পরিচিতি থাকলেও উহা নিঃসন্দেহে দিরার বা জেরার মসজিদ হিসাবে পরিগণিত হবে। কিন্তু সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া শরীফ বাইতুন্নুর শাহী মসজিদে উপরোক্ত কারণসমূহের কোনোটারই আলামত বিদ্যমান ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। শুধুমাত্র পূর্ব অবস্থিত মসজিদটির অবস্থানটা মসজিদ নামীয় উইলপত্র ছিল না, সংখ্যাগরিষ্ঠ ওয়ারিশগণ মসজিদ ঘরটির জায়গাটি নিজের বলে দাবী করে। অংশটি নিম্নরূপ ছিল-

জহুর বাবার (রঃ) নিজ নামীয় ১৬ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠানটি ছিল। ওয়ারিশ হিসাবে সন্তানগণ আট ভাই প্রত্যেকে ২ শতাংশের মালিক হন। ৮ শতাংশ জমির উপর নির্মিত ভবনটির অর্ধেক মাজার ও অর্ধেক মসজিদ ছিল। পাগলা বাবা (রঃ) মোট ২ শতাংশের মালিক। মাজারে অবস্থিত পাগলা বাবা (রঃ) স্বয়ং এবং তেনার মাতা মরহুমা আমিরুন্নেছা (রঃ) পুত্র মরহুম হযরত শাহ্ হাবীবুর রহমান ও পাগলা বাবার জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত শাহ্ আঃ আযীয (রঃ) এর একমাত্র স্ত্রী মরহুমা হযরত উলফাতুন্নেছা (রঃ) সমাধিস্থল রয়েছে। এখন কথা হলো ২ শতাংশ জমি মসজিদে গ্রহণ করলে মাযার থাকে অন্যদের জমিতে। আর আমাদের জনসংখ্যা অধিক থাকায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় সমাধিস্থ মাজারসমূহ গ্রহণ করে নেই। প্রতিপক্ষকে ইহার বিনিময়ে মসজিদ ঘরটি ছেড়ে

দিতে বাধ্য হই। তবে জহুর বাবার (রঃ) সমাধিটির এক অষ্টমাংশের অধিকার আমাদের রয়ে যায়। আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের কাছে পরিস্থিতির শিকার হয়ে যাই। যদিও মসজিদ গৃহটি আমার একক উদ্যোগে সকলের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছিল তথাপিও জায়গার কোন অধিকার না থাকায় অনিচ্ছাকৃতভাবে মসজিদটি ছাড়তে বাধ্য হই। মসজিদ দখল করলেও মসজিদের জমা খরচের কোন হিসাব তারা নেয়নি। যার বিভিন্ন বাকি বকেয়া আমাকে এখনো পরিশোধ করতে হচ্ছে। ওয়ারিশ সূত্রে দানকৃত জমি দখল করল কিন্তু ঋণ অর্থাৎ দেনাপাওনা আছে কি না তার খোঁজ নিল না।

মসজিদের পূর্ব অবস্থানঃ

যে মসজিদটি কটগেট টিনের ঘর ছিল, যে মসজিদটিতে জহুর বাবা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে নিয়মিত এক হাজার বার সুরা এখলাছ পাঠ করতেন এরূপভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অগাধ ভক্তি সৃষ্টির নিমিত্তে অসংখ্য দরুদ পাঠ করতেন, এইরূপ কৃচ্ছতা সাধনা করতে করতে সৌভাগ্যবশতঃ জনাব রাহমাতাল্লিল আলামীন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত জাগ্রত অবস্থায় দীদার নসীব হয় সেই মসজিদটির দক্ষিণ দিকে গিয়ে একটু পূর্ব দিকে আড়াআড়িভাবে জহুর (রঃ) বাবাকে সমাধিস্থ করা হয়। পরে কালের চক্রে জহুর বাবার (রঃ) সমাধি স্থল মসজিদ সংলগ্ন করে সমান সমান ভাবে parallal system এ নতুন মসজিদ তৈরি করা হয়। পুরাতন মসজিদ ঘরটি এরূপভাবে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এতে মসজিদ ও মাযার ঘরটি সমান সমান করে একটি নতুন ভবন তৈরি করা হয়। ইহাও নিম্নমানের আর্কিটেকচার পদ্ধতিতে নির্মিত হলে খুব শীঘ্রই মসজিদ ঘরটি হুমকির সম্মুখীন হয়ে যায়। পরবর্তীতে উহা ভেঙ্গে ফেলে অত্যাধুনিক মডেলে নির্মাণ প্রকৌশলীর পরামর্শে গৃহটি পুনঃ নির্মিত হয়। মোদ্দাকথা হল এই যে, পুরাতন মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়ে যায়। উহাতে গরু ছাগল বাঁধা হয়। পরিত্যক্ত জায়গাটি অতীতে যেহেতু মসজিদ ঘর ছিল উহার পবিত্রতা রক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করতে প্রস্তাব পেশ করি। অংশীদারিত্বের দাবিতে প্রস্তাবটি ভন্ডুল হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, মসজিদটির পার্শ্বে পীর পারিবারিক একটি গোরস্থান রয়েছে। উহাতে অবস্থিত কবর অধিবাসীগণ আমাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষ ছিলেন। সেই হেতু জায়গাটি প্রাচীর বেষ্টিত করে গোরস্থানরূপে পরিচিত করতে প্রস্তাব রাখলে এতে কাহারও কাহারও ব্যক্তিস্বার্থে ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করল। এমতাবস্থায় পুরাতন মসজিদসহ (জহুর বাবা যে মসজিদে নামাজ পড়তেন) কবর স্থানটি অবহেলিত রয়ে যায়। এখন আমার জিজ্ঞাসা হল এই যে, পূর্ব মসজিদের স্থান নিজ বাড়িঘরের সুবিধার্থে মসজিদ ঘর সরিয়ে নতুন মসজিদ তৈরি করলে

যদি নামাজ আদায় সঠিক হয় তবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য, স্বাধীনচিত্তে এবাদত বন্দেগী করার জন্য সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে ওয়াকফকৃত জমিতে সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া শরীফ বাইতুন্নুর শাহী মসজিদটি বর্তমান ব্যবহার চলতেছে। প্রতিপক্ষের কাছে আমার প্রশ্ন পূর্ব ও পশ্চাতের কথা চিন্তা করলে কেন জহুরিয়া শরীফ বাইতুন্নুর শাহী মসজিদে নামাজ জায়েজ হবে না?

মাজারের পশ্চাতে অবস্থিত ঐতিহাসিক আমগাছটির বিবরণঃ

একবার ওরসের সময় প্রচুর পানি সংকট দেখা দেয়। লোকেরা পাগলা হুজুরকে (রঃ) পানির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানায়। তখন পাগলাপীর হযরত শাহ্ ছমিরউদ্দিন আহমেদ (রঃ) উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা কেঁদে কেঁদে খোদার কাছে পানি চাও। এই অদ্ভুত উত্তরে জনগণ বিস্মিত হয়ে ভাবতেছিল এরূপভাবে কাঁদলে কতদিনে কিভাবে পানি পাওয়া যাবে। আর আশু কার্য কিরূপভাবে সমাধা করা হবে? এই ভেবে সকলে ফ্যাল ফ্যাল করে পাগলা হুজুরের (রঃ) দিকে চেয়ে রইল। তখন তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "আল্লাহর প্রেমে গাছ কাঁদে, গাছের ছেনা ফাঁটে অথচ তোমাদের অন্তর কাঁদে না" এই বলে তিনি গাছটির দিকে অঙ্গুলী ইশারা করলে এক বিকট আওয়াজ হয়ে গাছের ছেনা ফেটে গেল। এবং ঝরনার মতো পানি ঝরতে লাগল। এরূপভাবে তিনদিনব্যাপী অবিরাম পানি ঝরতে থাকলে পার্শ্বস্থ শুকনা পুকুরটি ভরে যায়। স্বাচ্ছন্দে সকল কার্য সমাধান হলে বরকতপূর্ণ পানি মনে করে মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ লোক পানি সংগ্রহ করতে থাকেন। এই ঐতিহাসিক গাছটি মাত্র এক হাজার টাকা দাম নির্ধারণ করে প্রতিপক্ষ নিজেই গ্রহণ করে নেয়।

হায় আফসোস! গাছের টাকা সহ পূর্বের জমাকৃত টাকা এবং গচ্ছিত বালু সিমেন্টের তাগাদা দিলে গরিমসি করে তা আর ফেরৎ দেয়া হয় নি। এমনকি দীর্ঘদিনের দানবাক্সের আয়ের ট্যাকাটিরও কোন হিসাব পাওয়া যায় নি। ছিঃ লজ্জার কথা! যে ঘরের দিকে নির্মাণকালীন একবার ফিরে তাকান হয় নি আজ তাহা বেলুর জুম্মা নামে পরিচিত কী করে হল?

প্রসঙ্গঃ ঐতিহাসিক আমগাছ কাটার চক্রান্ত ভাবতে অবাক লাগে। যেখানে অর্ধকোটি টাকা খরচেও তিনতলা মসজিদসহ পবিত্র মাজার শরীফের যাবতীয় ডেকোরেশন, সুউচ্চ মিনার, বৈদ্যুতিক ওয়ারিং, ওযুখানা, শৌচাগার, এক কথায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দর্শনীয় স্থান তথা তীর্থ ভূমির সৌন্দর্য বর্ধনে সুশোভন বিকাশে ঝাড় লণ্ঠন শোভিত, রঙবেরঙের পাথর দ্বারা কারুকার্য খচিত যে তীর্থ ভূমি স্বর্গীয় আভা দর্শককে অভিভূত করে, স্বভাবতই স্বশ্রদ্ধায় মাথা নীত হয়ে পরম করুণাময়ের বিচিত্র এই সৌন্দর্যময় জহুরীয়া শরীফ জামে মসজিদ ও মাজার

অত অল্প টাকায় নির্মাণ করা মোটেই সম্ভব নহে। এহেন পরিকল্পনা যার অধঃদেশে নিহিত ছিল, তার প্রথম তহবিল হিসেবে ঐতিহাসিক আমগাছটি কেটে মাত্র এক হাজার টাকা তহবিল করে নিয়ে পুরাতন ইমারতটি ভেঙে ফেললেন। পুরাতন ইমারতটি ভাঙার সুযোগে এই আমগাছটি মাত্র এক হাজার টাকায় বিক্রি করে তহবিল করা মোটেও সঙ্গত হয়েছে বলে মনে হয় না। এটা শুধু মাত্র একটি চক্রান্ত। যেহেতু জহুরীয়া দরবার শরীফে কোন এক সময় পানির অভাব হলে পাগলা পীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রঃ) অকাট্য কেরামতির এই মিঠা পানি দান করে বহু লোক অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কঠিন ব্যামো হতে আরোগ্য পেয়ে আজও বংশ পরম্পরায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। তীর্থ যাত্রীগণ তীর্থের কাকের ন্যায় যুগ যুগ ধরে অলী আল্লাহর নিদর্শন দেখার জন্য এই ঐতিহাসিক আমগাছটি ছিল শ্রেষ্ঠ কাম্য।

হায় আফসোস! আমার অনুপস্থিতিতে সেই পাগলা পীরের আওলাদগণ কোন আপত্তি না করে সাচ্ছন্দে এই গাছটি কাটতে সুযোগ দেন। আমি বাড়িতে থাকলে বলতাম এই গাছটি না কেটে তার বিনিময়ে মসজিদ মাজার নির্মাণের জন্য আমি একা দ্বিগুণ দশগুণ প্রয়োজনে একশগুণ টাকা দিতে চাইতাম। তবুও দোহাই তোমাদের কাছে এই আমগাছটি কেটো না। কিন্তু পাগলা পীরের এহেন আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ অকাট্য কেরামতিকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে পাগলা হুজুরের আওলাদগণ গাছটি কাটতে অনুমতি দেন। এক হাজার টাকা দিয়ে কি ইমারতটি নির্মাণ হয়েছিল? যা মসজিদের প্রথম তহবিল ছিল? না পাগলা পীরের বংশের গৌরবকে নির্মূল করার জন্য তার ঐতিহ্যকে চির নিপাত করার জন্য দর্শকদের আকর্ষণ নির্মূল করা এটাই ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। আমার দেশবাসী ও ভক্তবৃন্দের কাছে এটাই প্রশ্ন থেকে যাবে।

মসজিদ আলাদা হওয়ার পর ৭ই ভাদ্র অনুষ্ঠানে মাজারসমূহে গিলাপ চরানো ও ঝাড়বাতি দেয়ার জন্য মোঃ রুহুল আমীন চাচার ছেলেকে কয়েকজন সঙ্গীসহ মাজারে প্রেরণ করা হয়। তখন প্রতিপক্ষ মাজারে গিলাপ চরানো ও লাইটিং করাতে প্রবল বাধা প্রদান করে।

জ্ঞানী পাঠক! এখন বুঝে নিন মসজিদ মাজারসমূহ সার্বজনীন ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে কিন্তু এরূপ সংঘাতময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে কিরূপভাবে সর্বসাধারণ মুসল্লিবৃন্দ সেখানে নামাজ আদায় করতে পারেন?

প্রসঙ্গঃ তালা ভাঙ্গা

সুদীর্ঘ আটটি বৎসর কেটে গেল। আমার নিয়ন্ত্রণে মসজিদের যাবতীয় কাজ পরিচালিত হত। ইমামের বেতনসহ টিনের চালায় প্রতি বছর খুঁটিসহ যাবতীয় কাজ পরিচালিত হত। যখন মসজিদে মাইক ছিল না তখন প্রতি রমজান মাস ও

দুই ঈদে আমার নিজ খরচে ভাড়াটিয়া মাইকে মসজিদের কাজগুলো পরিচালিত হত। নিয়মিত ইমাম মোয়াজ্জিন থাকার কারণে বিভিন্ন ধর্মীয় পর্বগুলো পরিচালিত হত। আয়ের মধ্যে একটি দান বাক্স ছিল। যেটিতে প্রত্যেক হুজুরজাদাগণ নিজ নিজ পিতার মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপনে যে 'ফাতেহাখানী' অনুষ্ঠিত হত তার পূর্বের দিন মুছল্লিগণকে সাথে নিয়ে দান বাক্সের তালা খুলে তা খাতায় জমা করা হত। উনাদের ফাতেহাখানি শেষ হলে আবারও সকল মুছল্লির সম্মুখে দানবাক্সের তালা খুলে দেখা যেত যে, একটিও টাকা ভুলে কেহ দান বাক্সে ফেলে নাই।

ইহাতে সহজে অনুমান হয়, ওনাদের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল। তবে প্রতি মাঘ মাসে আমার অধীনে যে মাহফিলটি অনুষ্ঠিত হত তার পরদিন দানবাক্সের তালা খুলে দেখা যেত, আমার মাহফিলের দিনে যে পরিমাণ টাকা আসত, ওনাদের সকলের মাহফিলের পরদিন খুলে দেখা যেত আমার টাকার পরিমাণের চেয়ে তেনাদের এক দশমাংশ হত। এদিকে আমার নিয়ন্ত্রণে যতদিন দানবাক্সটি পরিচালিত হয় তন্মধ্যে মোট ৭০টি তালা ভেঙ্গে কে বা কাহারা দানবাক্সের টাকা লুটপাট করে কাজের বিঘ্নতা সৃষ্টি করত। এক জুম্মায় আলোচনা করে খোঁজ-খবর নিতে বললে অনেক সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। এতদসত্বেও আট বৎসরের মধ্যে মসজিদের শুধু তালা নয়, তালা লাগানোর লক হ্যান্ডেল এমনিভাবে ভেঙে দিত আর যেন তালা লাগা না যায়। তা পুনরায় মেরামত করতে অনেক সময় কেটে যেত। ইতোমধ্যে দান বাক্সের কোন টাকা আমার হস্ত গত হতো না। ৭০টি তালা ৭০ বার ভাঙলে ৭০ বার মেরামত করতে যত সময় চলে যেত ততদিন দান বাক্সে কোন টাকা আমার হস্তগত হতো না। কারণ লুটেরা গোষ্ঠী লুটের মহড়া চালাতো। আমিও মাঝেমধ্যে অভিমান করে বিলম্বে দান বাক্স মেরামত করতাম। এখন ভেবে দেখুন আট বছরের মধ্যে কত বৎসর আমার হাতছাড়া হয়েছিল? তথাপিও আমার কাছে মোট আট বছরে ২৬ হাজার টাকা জমেছিল। তা মুছল্লিগণের সামনে তালা খুলে হিসাব নিকাশের খাতায় জমা করা হয়েছে।

অথচ অতীতের কোন হিসাব এরূপভাবে জমা খরচের খাতায় দেখা যায়নি। এ কারণে হাজী মোজাম্মেল হক দরবেশ সাহেব অতীতে সর্বদলীয় নামে আর একটি দান বাক্স চালু করেছিলেন। দুটি ভেঙে একটি নতুন দানবাক্স তৈরি করা হলে আমার বাড়ি একটু দূরে থাকার কারণে তা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।

এখন বর্তমান দেখা যাচ্ছে একই তালায় অদ্যাবধি দানবাক্স পরিচালিত হচ্ছে। কারণ চোরেরা নির্বাসিত হয়ে গেছেন। আমার কাজটিতে কত প্রকারের বাধা ছিল সুধী পাঠক তা একটু ভেবে দেখুন।

॥ অসমাপ্ত ॥